চাঁদমামা
ডিসেম্বর ১৯৭৭

হাড়ের অলঙ্কার

সমুদ্রের গভীরে কত কিছু জানার আছে। এক জায়গায় পাওয়া গেল ৩৩০০০ প্রাচীন মানুষের হাড় আর এক জায়গায় দেখা গেল একটি আলয়ে মানুষের খুলি সাজিয়ে অলঙ্কারের মত ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিতে শ্মশানের একটি অংশ দেখানো হল। এখানে দুহাজার খুলি দিয়ে সাজানো হয়েছে।

মায়া সরোবর
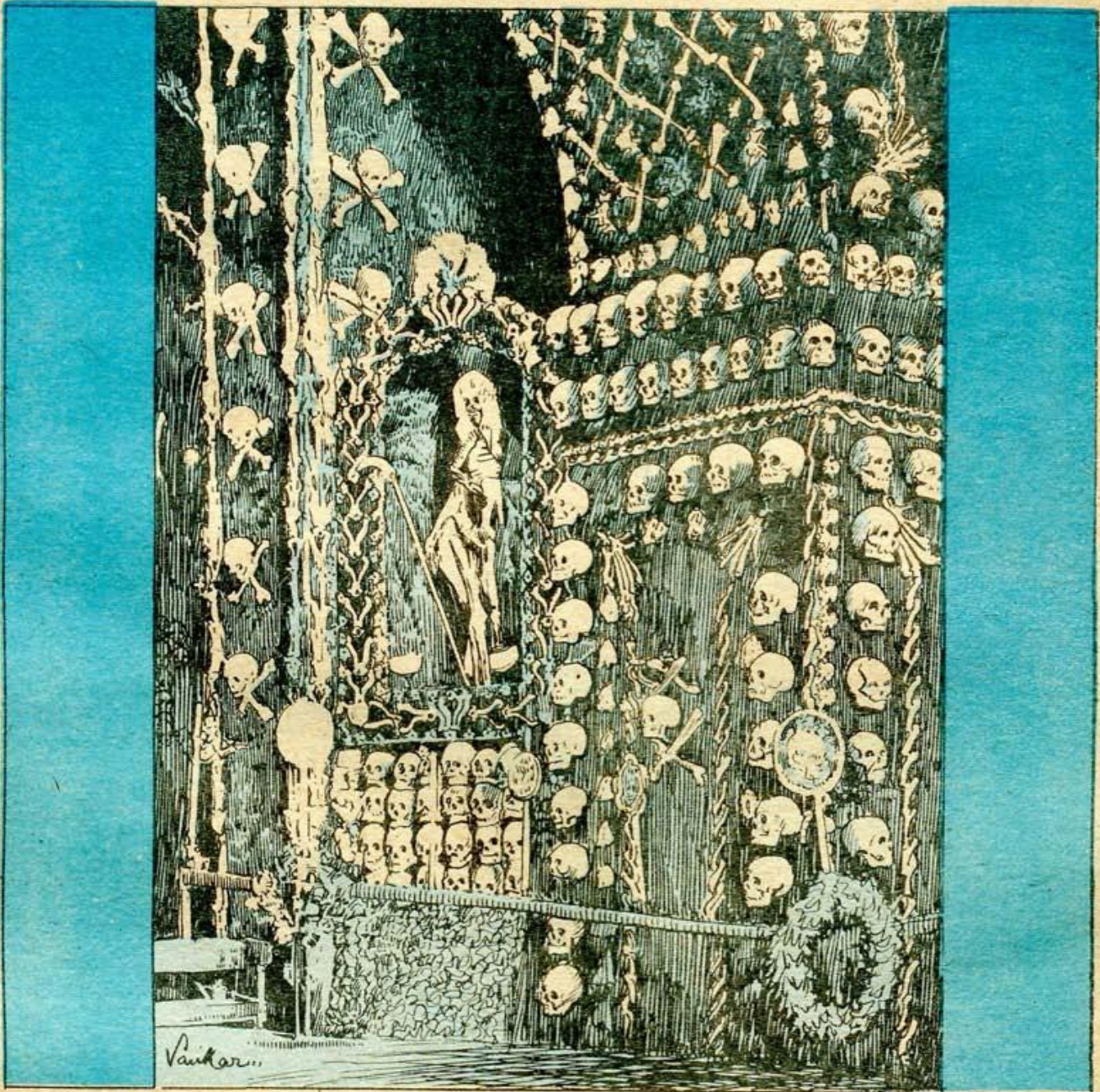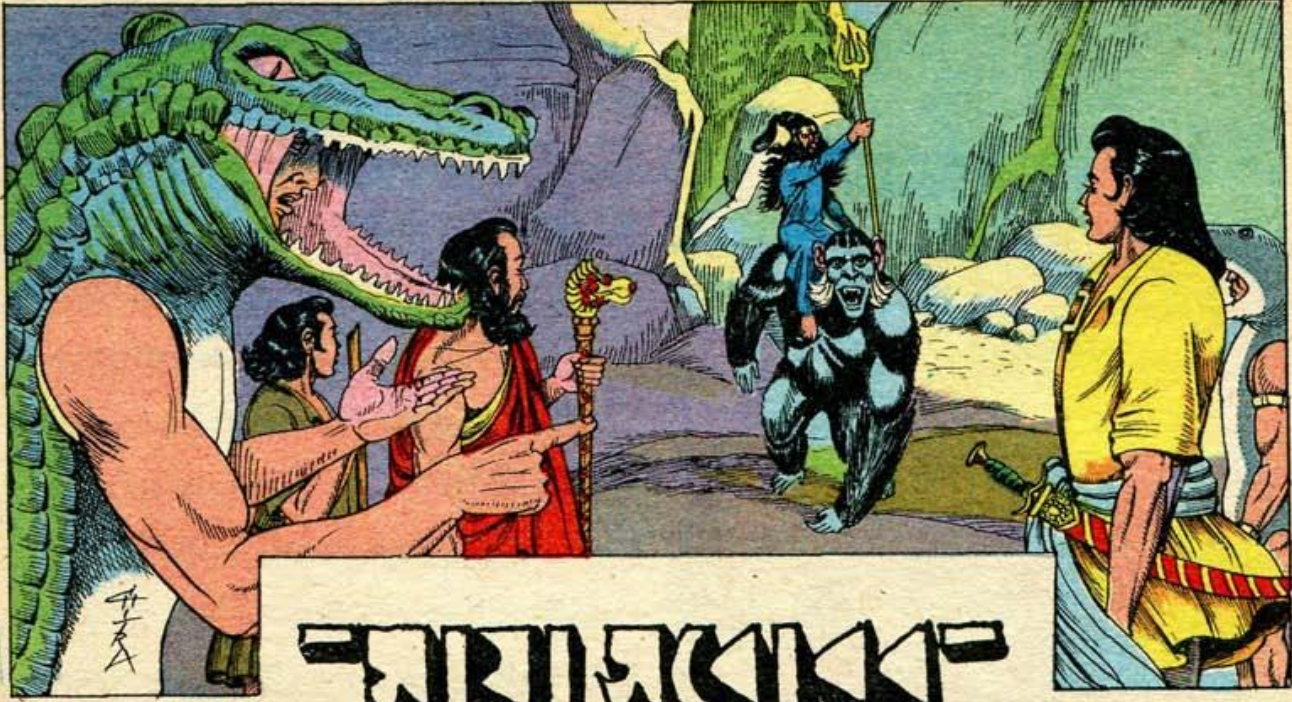
বাইশ

[নদীর তীরের পাহাড়ী গুহার সামনে জয়শীল, সিদ্ধসাধক ও মকরকেতুকে দেখা গেল। সেখানে আরও দুজন ছিল। জয়শীলের বাল্যবন্ধু দেবশর্মা ও সেনাপতির ছেলে মঙ্গলবর্মা। সিদ্ধসাধক জলগ্রহের ভয়ঙ্কর ক্রোধ থেকে নর-দানবকে বাঁচাল। নর-দানব এই ভীষণ বিপদ থেকে বেঁচে ওঠায় সাধকের সামনে নত হয়ে গড়াগড়ি খেল। তারপর···]

নরদানবকে সিদ্ধসাধকের বশে আসতে দেখে মকরকেতু ও অন্যান্যরা অবাক হল। ·জয়শীল খুশী হয়ে হেসে বলল, "এতদিনে সাধক একটি বাহন জোগাড় করতে পেরেছে। বাহন হিসেবে যেমন ভাল তেমনি ভয়ঙ্কর। কৃপাণজিৎকে এটা মেরে ফেলতে বাকি রেখেছলি। সর্পস্বরাকে তুলে নিয়ে গেল। কি করে যে নরদানবের খপ্পর থেকে সর্পস্বরা জ্যান্ত ছাড়া পেল সেটা সত্যই রীতিমত ভাববার বিষয়। আর তা ছাড়া—আরো একটা কথা—"

"সর্পস্বরাকে নরদানবের কাছ থেকে আমিই রক্ষা করেছি। তার কাছ থেকেই জানতে পেরেছি যে তুমি এখানে আছ।" মকরকেতু হাসি হাসি মুখ করে বলল।

জয়শীল এই মকরকেতুর আপাদমস্তক

দেখে নিয়ে বলল, "তুমিও তো কম আঘাত পাওনি কেতু। এই কথা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি যে এত তাড়াতাড়ি তুমি এসব ভুলে গেলে কি করে ?"

মকরকেতু দেবশর্মাকে দেখিয়ে বলল, "পাহাড়ের একপ্রান্তে আমি এতদিনে মরে পড়ে থাকতাম। ইনি চিকিৎসা করে আমাকে সারিয়ে তুললেন। লোকে বৈদ্যকে দেবতা বলে, আমি এঁকেই দেবতা বলে মনে করি। মাঝে আমি মায়াসরোবরে গিয়েছিলাম। মায়াসরোবর থেকে ফিরে এসে তোমাকে আমি অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেক দিন খুঁজেছি।"

অমরাবতী নগরের বাল্যবন্ধু, জুয়াখেলার সঙ্গী কবে যে বৈদ্য বিদ্যা শিখে চিকিৎসা করে দেবতা হয়ে গেল তা ভাবতে যেন জয়শীলের কষ্ট হল। জয়শীল জোড়হাত করে নমস্কার করে বৈদ্যদেবরূপী দেবশর্মাকে বলল, "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে দেখছি মঙ্গলবর্মা। সে কি আপনার অনুচর নাকি ?"

জয়শীলের কথায় হেসে দেবশর্মা বলল, "মঙ্গলবর্মা আমার শিষ্য। আমার কাছে সে বৈদ্যবিদ্যা শিখছে। ঐ মায়াসরোবরে যাওয়ার তার খুব ইচ্ছে। কি মঙ্গল, এঁকে বলনা—আমি কি ঠিক কথা বলছি তোমার সম্বন্ধে ?"

মঙ্গলবর্মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ নিজের খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল। এমন সময় আকাশে পাখা ঝাপটানোর প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। সকলে একই সাথে মাথা তুলে উপরের দিকে তাকাল।

ওরা লক্ষ্য করল, আকাশপথে একটি রথ নিয়ে কয়েকটি অতি সুন্দর হাঁস উড়ছে। এই দৃশ্য দেখে মকরকেতু, সর্পনখা ও সর্পস্বরা হাতজোড় করে উপরের দিকে মুখ রেখে জোরে চিৎকার করে বলল, "জয় মায়াসরোবরেশ্বরের জয় !"

সেই চিৎকার রথের আরোহী হয়ত শুনতে পেয়েছে। পরমুহূর্তে ঐ রথ কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার আকাশ পথে চলে যেতে লাগল। কিন্তু চোখের পলকে সবাই লক্ষ্য করল, জয়শীল প্রভৃতি যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কিছুদূরে সেই সুদৃশ্য রথ নামল নামল নদীর জলে।

রথ জলে নামতেই মকরকেতু, সর্পনখা ও সর্পস্বরা অবাক হয়ে গেল। তারা বলল, "একি! সরোবরেশ্বর কোথায়? এতো তো দেখছি তাঁর দেহরক্ষী আছে! মায়া সরোবরেশ্বরকে ছেড়ে শুধু একা দেহরক্ষী আসবে কেন?" বলতে বলতে ওরা তিনজনে জলে নেমে রথের কাছে গেল।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল জয়শীল, সিদ্ধসাধক, বৈদ্যদেব নামধারী দেবশর্মা ও সেনাপতির ছেলে মঙ্গলবর্মা।

জয়শীল দেবশর্মাকে চোখের ইশারা করে মঙ্গলবর্মাকে বলল, "শোনো মঙ্গল, আমরা শত্রু নই, মিত্রও নই। তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে তুমি মায়াসরোবরেশ্বর থেকে ফিরে এসেছ। সেখানে কনকাক্ষ রাজার ছেলে-মেয়ে কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চনবর্মা কেমন আছে অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে বলবে কি?"

মঙ্গলবর্মা কি একটা জবাব দিতে গিয়ে দেবশর্মার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, "এইধরণের প্রশ্নের
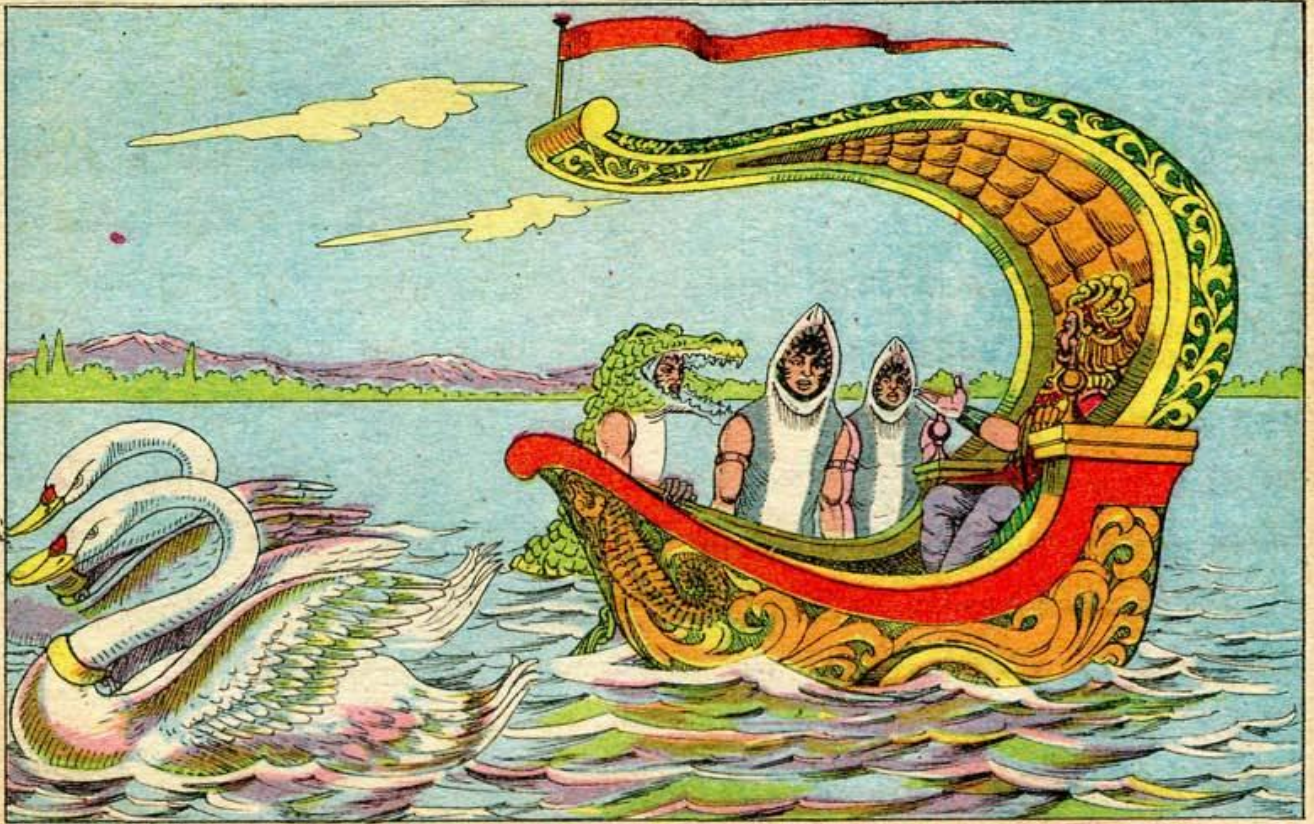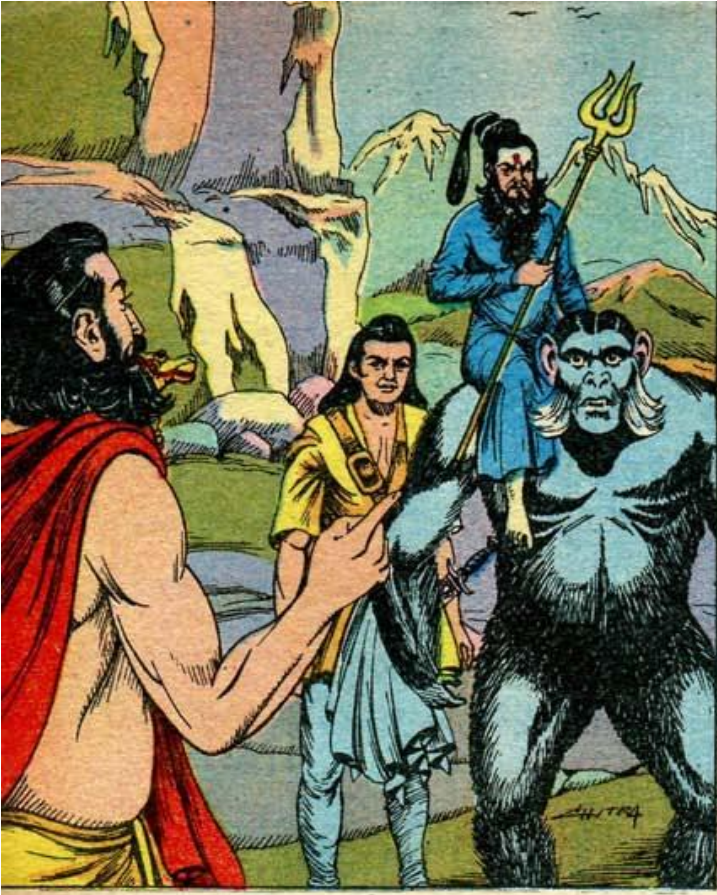
জবাব দিতে হলে আমাকে আমার গুরুদেব বৈদ্যদেবের অনুমতি নিতে হবে।"

জয়শীল তাকে প্রশংসা করতে গিয়ে বলল, "মঙ্গলবর্মা, তোমার গুরুভক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। বেশ, প্রশ্নটা আমি বৈদ্যদেবকেই করছি!"

এমন সময় "জয় মহাকাল" বলতে বলতে সিদ্ধসাধক নরদানবের পিঠে চড়ে সেখানে হাজির হয়ে বলল, "জয়শীল, অহেতুক এই জলপাখিদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছো কেন? আমার ধারণা কি জান, ঐ রথে চড়ে কুমীরমুখো লোকটা আর তার দুই সহচর পালানোর তাল করছে।"

জয়শীল বলল, "সাধক, ওরা যদি সত্যি সত্যি পালানোর তাল করে আমরা কি ওদের আটকাতে পারব? কি করে আমরা ওদের আটকাবো বলো তো? ওদের দুটো অনুচর তো এখানে আছে।"

সাধক মঙ্গলবর্মা ও দেবশর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাকে তুমি মঙ্গলবর্মা বলছ তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে না যে সে কিছু জানে। আর অন্যজনকে দেখে কেউ বলবে না যে সে জলের বাসিন্দা। আমরা যাদের সাহায্যে মায়াসরোবরে যেতে পারি তারা এখন রথের কাছে চলে গেছে। একবার যদি ওরা সবশুদ্ধ কোনক্রমে পালিয়ে যায় আমরা আর কিন্তু কোনদিনই মায়া-সরোবরে যেতে পারবো না।"

তার কথা শুনে দেবশর্মা একটু রেগে গিয়ে বলল, "সাধক, তুমি চিন্তা করে কথা বলছ না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ। মকরকেতু কাজকর্ম ছেড়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলে কেন এসেছে জান? ওর উদ্দেশ্য তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে মায়াসরোবরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে যেসব জলবৃক্ষ আছে সেগুলো বিরাট বিরাট রাক্ষসের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ওদের জলরাক্ষস বলা যায়।"

"জলরাক্ষস! ঐ রাক্ষসদের আমি এই ত্রিশূল দিয়ে গেঁথে মেরে ফেলব। আমার এই ত্রিশূলের সামনে যেকোন রাক্ষসকেই নত হতেই হবে। আর জয়শীলের কাছে আছে ভয়ঙ্কর তরবারি। ঐ তরবারি দিয়ে ইচ্ছে করলে অনেক কিছু বা যা খুশী তাই করা যায়।" সাধক সদর্পে বলল।

সাধক জানেনা দেবশর্মার আসল পরিচয়। এভাবে কথা চলতে থাকলে কিছুক্ষণ পরে দেবশর্মার সাথে সাধকের বিবাদ লাগতে পারে। এই বিপদের আশঙ্কা করে জয়শীল দেমশর্মাকে বলল, "হে দেবশর্মা, আপনার শিষ্য মঙ্গলবর্মাকে ঐ রথের কাছে পাঠান। ওদের কথা শুনে আসতে বলুন।"

দেবশর্মা বুঝল জয়শীল কেন এই ধরনের কথা বলছে। সে মঙ্গলবর্মাকে বলল, "শিষ্য মঙ্গল, তুমি ঐ রথের কাছে একবার যাও তো। ঐ রথে মায়া-সরোবরেশ্বর তো নেই, শুধু তাঁর দেহরক্ষী আছে। ভাল করে জেনে এসো তো ব্যাপারটা ঠিক কি।"

মঙ্গলবর্মা দেবশর্মার সামনে মাথা নুইয়ে নমস্কার করে রথের দিকে এগিয়ে গেল। ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়শীল দেবশর্মাকে বলল, "শর্মা, এখন বল তো, ব্যাপারটা ঠিক কি? মায়াসরোবরেশ্বর আমাদের রাজকুমার ও রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে গেছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রাজকুমার ও রাজকুমারী এখন কেমন আছে তুমি জান?"

"ওরা দুজনে ভালোই আছে। তবে যেহেতু ওরা এখনও ফেরেনি সেইহেতু হিরণ্যপুরের রাজা দুঃখে ভেঙে পড়ছেন। আর এদিকে মায়াসরোবরেশ্বরও রাজ-কুমার ও রাজকুমারীকে অপহরণ করে এতদিনে খুবই অনুতপ্ত হচ্ছে।" দেবশর্মা জয়শীলকে সবকিছু সবিস্তারে বলল।

ওদের কথা হয়ত আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু সাধক গুটি গুটি ওদের কাছে এসে বলল, "জয়শীল, কি ব্যাপার বল তো? তোমরা দুজনে যেভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছ তাতে আমার মনে হচ্ছে তোমরা পরস্পরকে আগে থেকেই চিনতে। আমি যা অনুমান করছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তা আমার কাছে প্রকাশ করছ না কেন? সে কথাটা আমায় বড়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে জয়শীল।"

জয়শীল ফিসফিস করে বলল, "সাধক, অত অস্থির হচ্ছ কেন? সব বলব। এই দেবশর্মা আমার বাল্যবন্ধু। আমরা দুজনেই অমরাবতীর বাসিন্দা। একবার জুয়োর ঘরে কি হয়েছিল জান—যাকগে ওটা একটা বিরাট কাহিনী। তবে এখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। মকরকেতু যেন টের না পায় যে আমরা পরস্পরের বন্ধু। জানতে পারলে আমরা কিন্তু কোনক্রমেই কোনদিনই মায়াসরোবর থেকে মহারাজ কনকাক্ষের পুত্র-কন্যা কাঞ্চনমালা ও কাঞ্চনবর্মাকে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারব না।"

"তাই নাকি! তাহলে এই রথ এখানে এলো কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে? আমার ধারণা—তোমার এই দেবশর্মা সব জানে।" বলতে বলতে সিদ্ধসাধক দেবশর্মাকে জড়িয়ে ধরল।

দেবশর্মা হাসতে হাসতে সাধকের কাঁধে হাত চাপড়ে বলল, "মায়াসরোবরের জলবৃক্ষ রাক্ষসটিকে তুমি যদি মেরে ফেলতে পার তাহলে মায়াসরোবরেশ্বরের সমস্ত শক্তি তুমি পাবে। ঐ জলবৃক্ষ তোমার মহাকালের শত্রু।"

"তাই নাকি! তাহলে ওকে ধরেই আমি নর-দানবের সামনে ফেলে দেবো। ওর একবেলার খোরাক হবে। কি বল নর-দানব?" এই কথা বলতে বলতে সাধক নর-দানবের পিঠ চাপড়াল।

নর-দানব দু-একবার লাফাল। তারপর সেটা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা জলগ্রহ হাতির দিকে এগিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সাধক এগিয়ে তাকে ধরে বলল, "দাঁড়াও নর-দানব, এখন আমরা মকরকেতু এবং তার মালিক মায়সেরোবরেশ্বরের পরম বন্ধু। এই কথাটা এখন থেকে সবসময়ে ঠিকভাবে মনে রাখবে।"

দেবশর্মা না হেসে আর পারল না। সে বলল, "আমার ধারণা, মায়াসরোবরে কোন একটা গোলমাল বেঁধেছে। তা যদি না হত তাহলে মায়াসরোবরেশ্বর রথটিকে ছেড়ে দিত না। এই রথে সে নদীর বুকে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ রথটি যে এখানে নামল এটা আমার কাছে বড়ই অস্বাভাবিক কাণ্ড।"

দেবশর্মার কথা শেষ হওয়ার আগেই মাথা নিচু করে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মকরকেতু ছলছল চোখে বলল, "বৈদ্যদেব, কিছুক্ষণ আগে জলবিহার করার সময় মায়াসরোবরেশ্বর এবং তার সঙ্গে কাঞ্চন-মালা নামে যে রাজকুমারী ছিল তাকে জলবৃক্ষ রাক্ষস হঠাৎ ধরে জল থেকে ওপরে তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। তা লক্ষ্য করে রথের চালক ঝট্ করে রথটিকে উপরের দিকে তুলে নিল।" মকরকেতু আর বলতে পারল না। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, "বৈদ্যদেব,

একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। হংসরথ আকাশপথে ওড়ার সময় হঠাৎ একঝাঁক নতুন ধরণের পাখি রথটিকে চারদিক থেকে আক্রমণ করল। ফলে রথের চালক, মায়াসরোবরেশ্বর এবং রাজকুমারী ঘাবড়ে গিয়ে রথ থেকে নিচে পড়ে গেল। ওরা যে এই জন-মনুষ্যহীন বনের কোথায় পড়ে আছে সে-কথা কে জানে।" মকরকেতুর এই কথা শুনে জয়শীল, সিদ্ধসাধক ও দেবশর্মা থ বনে গেল।

"রাজকুমারী কাঞ্চনমালা যদি অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে যে এখনও বেঁচে আছে এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই। সাধক, আমরা যে এতদিন পরিশ্রম করেছি, দেখা যাচ্ছে তা বৃথা হল।" খাপ থেকে তরবারি দূরে ছুঁড়ে ফেলে জয়শীল বলল।

দেবশর্মা অনুতপ্ত হয়ে কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমন সময় সাধক সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অত হতাশ হলে কি চলে? রথ থেকে কোন ঝোপঝাড় অথবা জলেও তো পড়তে পারে। এখন আমাদের কর্তব্য হবে ওদের এই অরণ্যে খোঁজা। ওদের খোঁজার জন্য কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা এক্ষুণি মায়াসরোবরে রওনা হয়ে যেতে পারি। ঐ জলরাক্ষস বৃক্ষটিকে কেটে ফেললেই ভাল হয়।"

সাধকের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ ওরা একটা প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পেলো "জলরাক্ষস আসছে, ঐ যে—জলরাক্ষস আসছে!"

সকলে মুখ ঘুরিয়ে দেখল যেদিক দিয়ে আওয়াজ আসছিল সেদিকে। ওরা লক্ষ্য করল হরিণের মত শিংধারী কয়েকটি রাক্ষসকে। ওদের লক্ষ্য হল রথ। ওরা চারদিক থেকে রথকে ঘিরে ফেলার জন্য তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে। [চলবে]
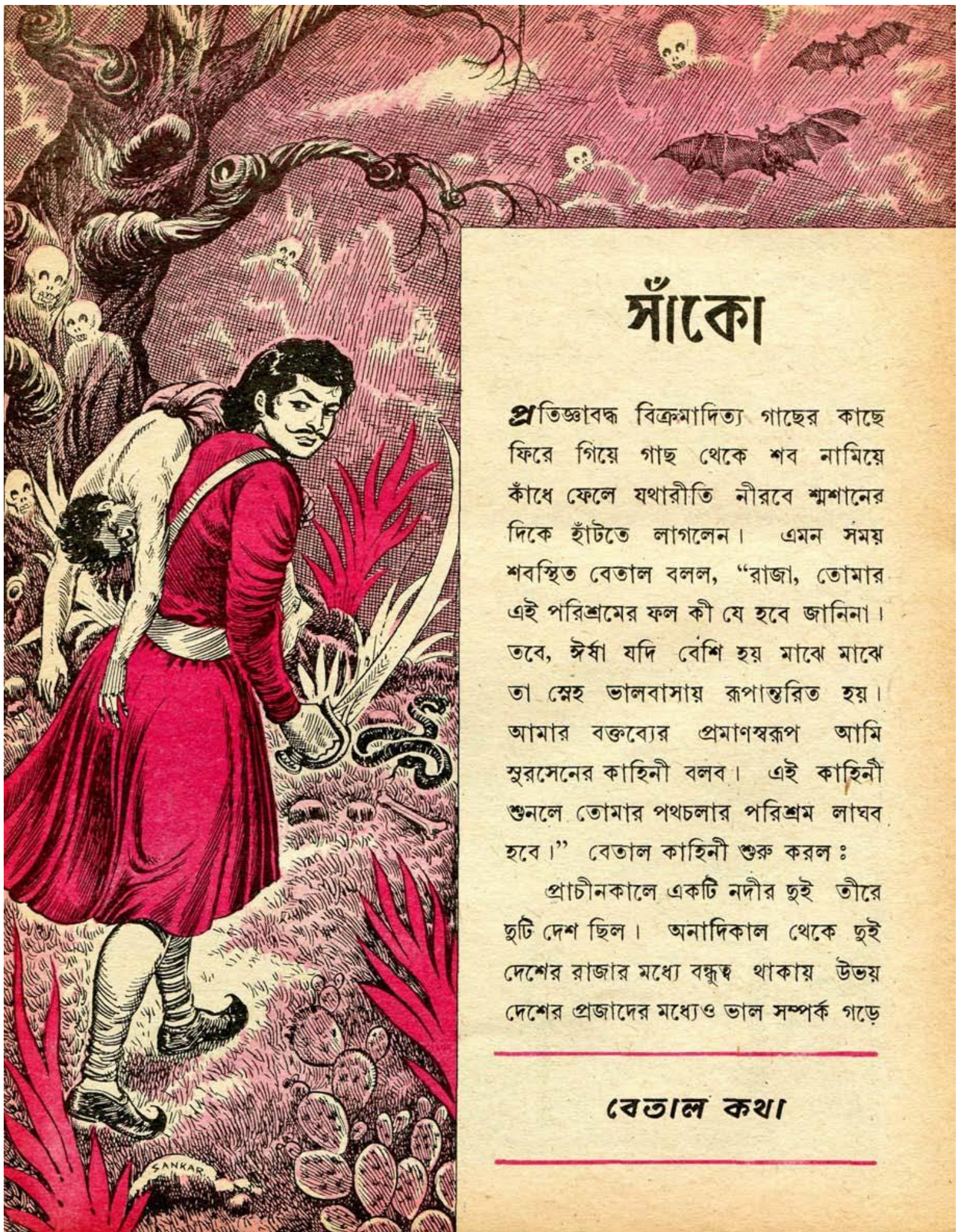
সাঁকো

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় শবস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার এই পরিশ্রমের ফল কী যে হবে জানিনা। তবে, ঈর্ষা যদি বেশি হয় মাঝে মাঝে তা স্নেহ ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়। আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ আমি সুরসেনের কাহিনী বলব। এই কাহিনী শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম লাঘব হবে।" বেতাল কাহিনী শুরু করল :

প্রাচীনকালে একটি নদীর দুই তীরে দুটি দেশ ছিল। অনাদিকাল থেকে দুই দেশের রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকায় উভয় দেশের প্রজাদের মধ্যেও ভাল সম্পর্ক গড়ে

উঠেছিল। দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এক দেশ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে অন্য দেশ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত। উভয় দেশের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নদীর উপর একটি সাঁকো ছিল।

এইভাবে চলছিল বহুকাল ধরে। তারপর কোন এক কারণে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। উভয় দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ না বাধলেও যার দিকে সাঁকোর যে অংশ ছিল সে তা ভেঙে ফেলল। ফলে সাঁকোর উপর দিয়ে যানবাহনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। তবে নৌকো করে লোকের যাতায়াত তখনো বজায় ছিল। যাতায়াতের পথ ভেঙে ফেলায় সেই সুন্দর সাঁকোর দিকে তাকিয়ে বহু প্রজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত।

এর আরও কিছুকাল পরে দুই দেশের রাজারা মারা গেল। তাদের ছেলেরা হল রাজা। নদীর বাঁ দিকে ছিল রাজা শান্তিসেন আর ডানদিকে ছিল রাজা সুরসেন। দুজনেই ছিল বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান্। ওদের আমলে প্রজারা মোটামুটি সুখেই কাটিয়েছিল।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে সুরসেন একটি বিষয় জানতে পারল সেটি হল তার প্রজাদের মধ্যে কয়েকজন মনে মনে

শান্তিসেনকে পছন্দ করে। এমন কি নিজেদের মধ্যে তাকে প্রশংসাও করে। শান্তিসেন নাকি মস্তবড় দাতা। সুরসেন ভাবল, আমিও তো দানধর্ম করি। আমার কথা কি একই ভাবে শান্তিসেনের দেশের লোক বলাবলি করে? এ ধরণের নানা কথা ভেবে সে আরও বেশি করে দানধর্ম করতে লাগল।

হঠাৎ সুরসেন বেশি করে দানধর্ম করায় তার সুনাম হওয়ার পরিবর্তে দুর্নাম হল। লোকে বলাবলি করল, "সুরসেন রাতারাতি বেশি করে দান করে শান্তিসেনকে খাটো করার চেষ্টা করছে। এইভাবে কাউকে খুব ছোট করা যায়না।"

গুপ্তচরদের মাধ্যমে এই কথা কানে যেতেই সুরসেন ভীষণ রেগে গেল। শান্তিসেনের উপর তার এত ঈর্ষা হল যে রাত্রে তার ভাল ঘুম হত না।

শেষে সুরসেন ঠিক করল, ছদ্মবেশে শান্তিসেনের রাজ্যে গিয়ে শান্তিসেন কী করে তা নিজের চোখে দেখবে।

তারপর সুরসেন মন্ত্রীদের উপর কাজকর্মের ভার দিয়ে সাধারণ পোশাকে নৌকো পেরিয়ে শান্তিসেনের দেশে ঢুকল। একটা ধর্মশালায় থেকে কান খাড়া করে সুরসেন শান্তিসেনের প্রজাদের কথা শুনতে লাগল। শুধু আশ্রমে নয়, ঘুরে বেড়িয়েও সে প্রজাদের কথা শুনতে
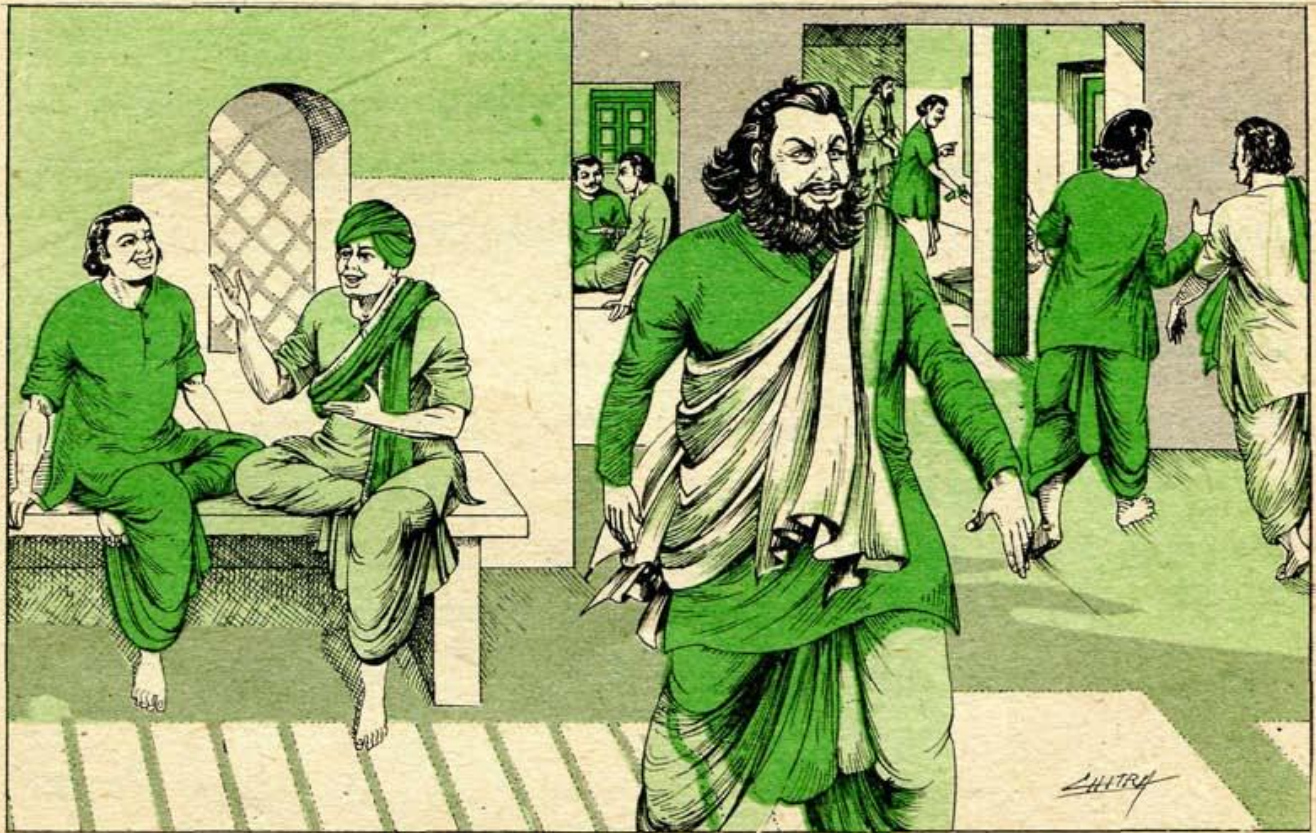
লাগল। প্রবাদ আছে, দূরের পাহাড় মসৃণ। কিন্তু দেখা গেল শান্তিসেনের বেলায় সেটা খাটে না। তার প্রজারাও তাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে।

ঘুরতে ঘুরতে, অনেক খুঁজেও, সুরসেন এমন একজনকেও পেল না যে তার প্রশংসা করে। এইভাবে অনেকদিন ঘুরে সুরসেনের ইচ্ছে করল নিজে গিয়ে শান্তিসেনকে পরীক্ষা করার। সে গেল শান্তিসেনের রাজপ্রাসাদে। যে-সময় রাজা সুরসেন গেল, সেই সময় রাজা সিংহাসনে বসে ছিল। তরে কোন একজন প্রজা দেখা করতে এসেছে শুনেই শান্তিসেন তার সঙ্গে দেখা করতে সাগ্রহে এগিয়ে এল। সুরসেন লক্ষ্য করল, শান্তিসেনের গায়ে সাধারণ পোশাক। তার আচার আচরণও অতি সাধারণ। এসেই বলল, "বলুন, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

সুরসেন বলল, "মহারাজ আমিও রাজবংশজাত। আমিও একসময় একটি দেশের রাজা ছিলাম। বিশেষ কারণে আমি আমার সিংহাসন হারিয়েছি। শুনেছি আপনি নাকি মস্তবড় দানশীল। তা আপনি কি আপনার রাজত্বের অর্ধেকটা আমাকে দান করবেন?"

শান্তিসেন হেসে বলল, "আপনি যে মহারাজা সুরসেন তা আমি জানি।" শান্তিসেনের বলার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে যে প্রহরীরা ছিল তারা তরবারি বের করল। কারণ তাদের চোখে এই সুরসেন হ'ল শত্রু রাজা।

তৎক্ষণাৎ শান্তিসেন ওদের তরবারি নামাতে বলে সুরসেনকে বলল, "সুরসেন, আপনার একটি দেশ আছে। সিংহাসনও আছে। তবে তাতে আপনার চাহিদা মিটছে না। তাই আপনি আমার গোটা রাজত্বই নিয়ে নিন। আমি সানন্দে দিয়ে দেব। আমি সাধারণ মানুষের

মত সাধারণ ভাবেই বাঁচতে চাই।"

রাজা শান্তিসেনের এই উদারতায় ও সরলতায় রাজা সুরসেন মুগ্ধ হল। শান্তিসেন যে শুধু নামেই নয়, কাজেও শান্তিকামী সুরসেনের সে-কথায় আর কোনো সন্দেহ রইল না। তাই— সঙ্গে সঙ্গে সুরসেন শান্তিসেনের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, "আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে সাঁকোটা ভেঙে গেছে সেটা সারিয়ে তোলাই এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ।"

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, শান্তিসেন কত বড় দানবীর যে অর্ধেক রাজত্ব চাইলে পুরোটাই দিতে চেয়েছিল? দিতে যখন চেয়েছিল সুরসেন নিয়ে নিতেই তো পারত। রাজত্ব নিয়ে শান্তিসেনকে যাতে সবাই ভুলে যায় তার ব্যবস্থা করতে পারত। তা না করে সে ক্ষমা চাইল কেন? আমার এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি তুমি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "সুরসেন শান্তিসেনের অর্ধেক রাজত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেননি। শান্তিসেন যে কতবড় দাতা তা পরীক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ঝোঁকের মাথায় শান্তিসেন যা বললেন তাতে সুরসেন দুই দেশের রাজাও হতে পারতেন। আবার হাতের মুঠোয় পেয়ে সুরসেনকে মেরে ফেলে শান্তিসেনও উভয় দেশের রাজা হতে পারতেন। এই ঘটনার ফলে পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে চিনতে পারলেন। তাই উভয় দেশের মধ্যে সাঁকো আবার তৈরি করার উদ্যোগ দেখা দিল।"

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
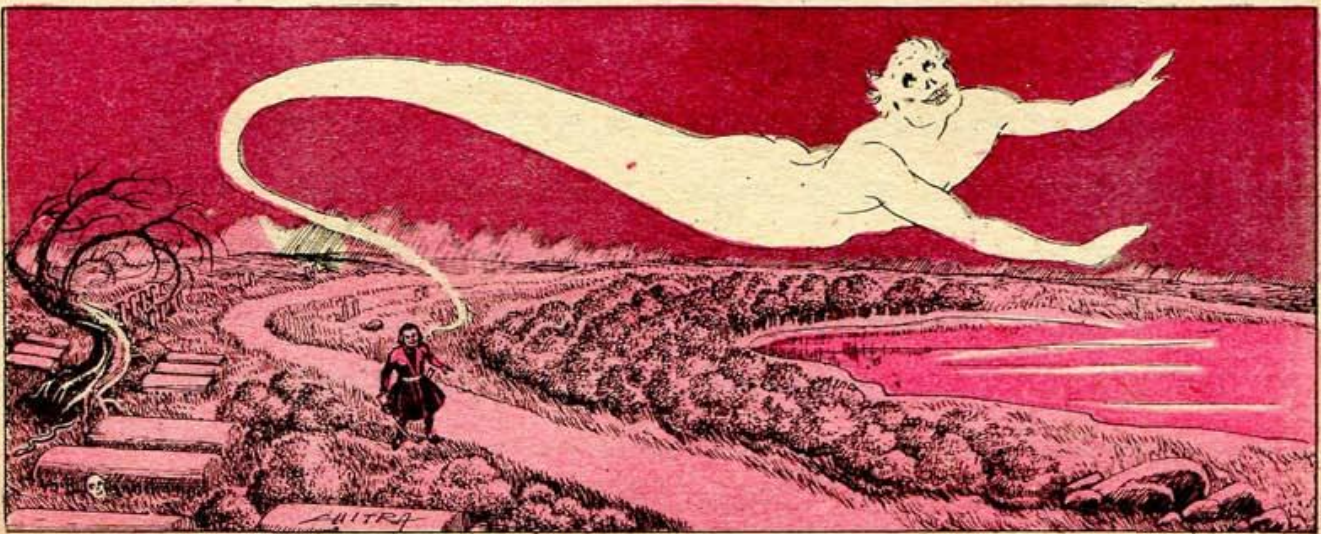
মানুষ ও ভূত

ঘন কালো আকাশ। গোটা আকাশ যেন কালো মোড়কে ঢাকা। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। ঝড় বইছিল জোরে। মাঝে মাঝে এমন সশব্দে বজ্র পড়ছিল যে বড়দেরও ভয় করছিল। বিদ্যুতের চমকে চমকে উঠছিল লোকজন। এই অবস্থায় বুড়ির টালির ঘর দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে ঘরটা ধ্বসে পড়ে যাবে।

সেই রাত্রে ঐ ঘরে তিনজন যাত্রী আশ্রয় নিয়েছিল। সমর, শেখর ও রাজু। ওরা একে অন্যকে চিনত না।

এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকার পর কথায় কথায় হঠাৎ ভূতের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হল। সমর ভূতের বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলো এইভাবে ঃ

"আমি তখন চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছি। একটি গ্রামে রাতটা কাটিয়ে সকালে শহরে পৌঁছেছি। ভোররাত্রেই শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। গ্রামের যে জায়গায় আমি রাতটা কাটিয়েছিলাম সেটা ছিল একটি ধর্মশালা। বেরনোর মুখে, অত ভোরে বেরোতে অন্যেরা আমাকে বারণ করেছিল। পথে একটি তেঁতুলগাছে নাকি একটা ভূত আছে। তবে আমি ভূত বিশ্বাস করতাম না। তাই আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম।

পথে শ্মশান পড়ল। তার কাছাকাছি আসতেই শুনতে পেলাম শেয়ালের ডাক, পেঁচার আর্তনাদ। পাশেই ছিল তেঁতুলগাছ। তার কাছাকাছি যেতেই ডালপালাগুলো নড়ে উঠল। আমার একটু ভয় ভয় করল। গাছের ওপরে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ডালপালার মাঝে মাঝে সাদা সাদা কি একটা দেখলাম। মনে মনে ভাবছিলাম ভূত কি এইরকম দেখতে? দেখছি এমন সময় গাছের ওপর থেকে আওয়াজ এল, 'কে ওখানে? এত সাহসী কে? কে এদিকে আসছে?' তার গলাটা খুব গম্ভীর ছিল। আমি মনে মনে সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। তবু বুকে সাহস সঞ্চয় করে চিৎকার করে বললাম, 'আমিও ভূত।' পরক্ষণেই গাছের উপর থেকে সশব্দে নিচে কে যেন পড়ল। তখন আমার কাছে সব পরিষ্কার হল। বুঝে নিলাম এই লোকটাই ভূতের অভিনয় করে দিনের পর দিন মানুষকে ঠকাচ্ছে। ঝট্ করে তাকে ধরে নিয়ে গেলাম। সবাইকে জানিয়ে দিলাম, এই যে এই সেই ভূত। এই ভূতকেই আপনারা দিনের পর দিন ভয় করতেন।"

সমরের কাহিনী শেষ হতেই শেখর শুরু করল, "চাকরি করার জন্য আমিও শহরেই বাস করছি। তবে এখনও শহরে কোন ঘর ভাড়া পাইনি। তাই শহরের শেষে একটা পোড়ো ঘরে রাত্রিটা কাটাতাম। লোকে বলত, ওটা ভূতের বাড়ি। তবে আমার ভূতের ভয় ছিল না। প্রত্যেকদিন রাত্রে ভাল করে ঘরের
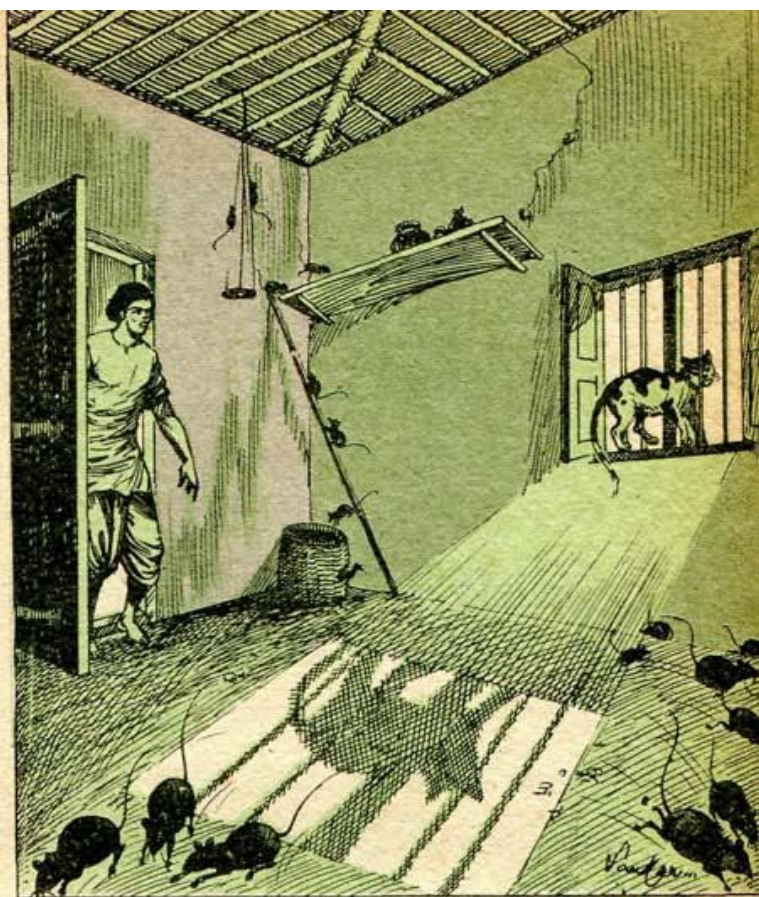
দরজা বন্ধ করে ঘুমোতাম। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর শুনতে পেলাম, হাততালি আর নূপুরের শব্দ। ছায়া ছায়া মূর্তিও নজরে পড়ল। খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, বাইরের নারকেল গাছের পাতার ছায়া জ্যোৎস্নার রাত্রে ঘরে পড়ছে। তবু শব্দটা যে কোথেকে আসছে তা দেখার জন্য এদিক ওদিক গেলাম। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি হাজার হাজার ইঁদুর ছুটোছুটি করছে আর ওদের ধাওয়া করছে একটি পোষা বিড়াল। তার গায়ে বাঁধা আছে নূপুর। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি

জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল। ঐ বাড়ির মালিক আমার উপরে খুব খুশী। আমি যে ঐ বাড়িতে থাকি, আলো জ্বালি তাতেই সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে সে ভাড়া নিতে চায় না। আসলে ভূত টুত বাজে কথা। সব মনের ভ্রম।"

তারপর রাজু শুরু করল নিজের অভিজ্ঞতার কথা: "একবার যেতে যেতে দেখি একটা বাড়ির সামনে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঐ বাড়ির এক মেয়েছেলের ঘাড়ে নাকি ভূত চেপেছে। আমার হঠাৎ ইচ্ছে করল ওঝা সাজার। আমি ওদের ভেতরে ঢুকে বললাম, 'সরে যাও, ওর ঘাড়ে যে ভূত চেপে আছে সেটা আমি নামিয়ে দিচ্ছি।' বলে আমি ঐ মেয়েকে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম। তারপর তার গালে টেনে একটা চড় কষিয়ে বললাম 'সত্যি কথা বল, তুমি এসব অভিনয় করছ কেন? সত্যি কথা না বললে আমি তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।' মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কি করব, আমার সৎমা আমাকে চিররুগ্ন এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়।' তার কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হল। আমি বললাম, 'তোমাকে আর অভিনয় করতে হবে না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি।' পরে তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হল। আসলে ভূতটুত ওসব হল পেটগরমের স্বপ্ন।"

তারপর বৃষ্টি থেমে গেল। ওরা তিনজনে ঘরের এককোণে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে রোদ উঠলে ওদের তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই ওরা তড়িঘড়ি জেগে উঠল।

উঠে বসে দেখল, ঐ বুড়ি নেই। টালির ঘরও নেই। ওরা বসে আছে শ্মশানের একটি বড় সমাধির উপর।

সত্যবাদী সুবল

স্বর্ণরেখা শহরের কাছে একটি গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে সুবল নামে এক যুবক ছিল। সে সকালে উঠে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে যেত। কাঠ কেটে বিক্রী করে দিনে দুটাকা রোজগার করত। ঐ দুটাকার মধ্যে এক টাকা মাকে দিত আর এক টাকা নিজের কাছে রাখত। সে ভাল জামাকাপড় পরে স্বর্ণরেখা শহরে ঘুরে বেড়াত। তার পোশাক এবং চালচলন দেখে শহরের লোক ভাবত, সুবল খুব ধনী পরিবারের ছেলে। তাকে শহরের সবাই সম্মান দিত।

একবার এক বিদেশী ব্যবসাদার জরির কাজকরা শাড়ি এনে স্বর্ণরেখা শহরে একটিও বিক্রি করতে পারল না। তার কারণ ওর কাছে হাজার টাকার কম দামে শাড়ি ছিল না। তার কাপড় দেখে প্রায় প্রত্যেকে মন্তব্য করল, "এত দামী কাপড় একমাত্র ধনীর দুলাল সুবল ছাড়া আর কেউ কিনতে পারবে না।"

ব্যবসাদার অনেকের মুখে সুবলের নাম শুনে সুবল যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে সেই রাস্তায় তার জন্য অপেক্ষা করল। তাকে ঘোড়ায় আসতে দেখে ব্যবসাদার নমস্কার করে সমস্ত বিষয় জানাল।

সুবল বেশ মেজাজে বেছে বেছে একটি শাড়ি ও মেয়েদের একটি জামা দেখিয়ে বলল, "এই দুটো আমার পছন্দ হয়েছে। কালকে ঠিক এই সময় আমি এখানে এসে এদুটো কিনে নিয়ে যাব।"

তারপর সুবল আর স্বর্ণরেখা শহরে পা দেয়নি। সে সেই রাত্রেই নিজের

করুণাসিন্ধু সেন

গ্রামের ঘরবাড়ি ছেড়ে একেবারে সোজা পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে রওনা দিল।

বনপথে যেতে যেতে সে লক্ষ্য করল অদূরে দুটো লোক কথা কাটাকাটি করছে। ওদের কাছে একটি পোঁটলা ছিল। ওদের কথায় সুবল জানতে পারল যে কোন এক রাজকুমার ঐ বনে কয়েকদিনের জন্য আস্তানা গেড়েছে। রাজকুমারের আস্তানা থেকে একটি পোঁটলা চুরি করেছে ঐ দুটি চোর। চোর দুটোর মধ্যে এখন ঝগড়া বেধেছে পোঁটলার ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে।

সুবল নানাধরণের জন্তু জানোয়ারের ডাক আগে থেকেই শিখে নিয়েছিল। সে ওদের দুজনকে ঝগড়া করতে দেখে, আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঘের ডাক ডাকল। বাঘের ডাক শুনে চোর দুজন প্রাণপণে ছুটে পালাল। ওদের পালিয়ে যাওয়ার পর চারদিক ভাল করে দেখে শুনে বাঘের ডাক ডাকতে ডাকতেই সুবল ঐ পোঁটলা তুলে নিল। তারপর সে রাজকুমারের আস্তানায় গেল ঐ পোঁটলা নিয়ে।

রাজকুমার ঐ পোঁটলা নিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনে 'সত্যবাদী সুবল' এই পদবি দিল এবং তার হাতে ঐ পোঁটলা সাগ্রহে দিয়ে তাকে বিদায় দিল। ঐ পোঁটলাতে চারহাজার টাকা ছিল।

পরদিন যথারীতি সুবল কাঠ কেটে
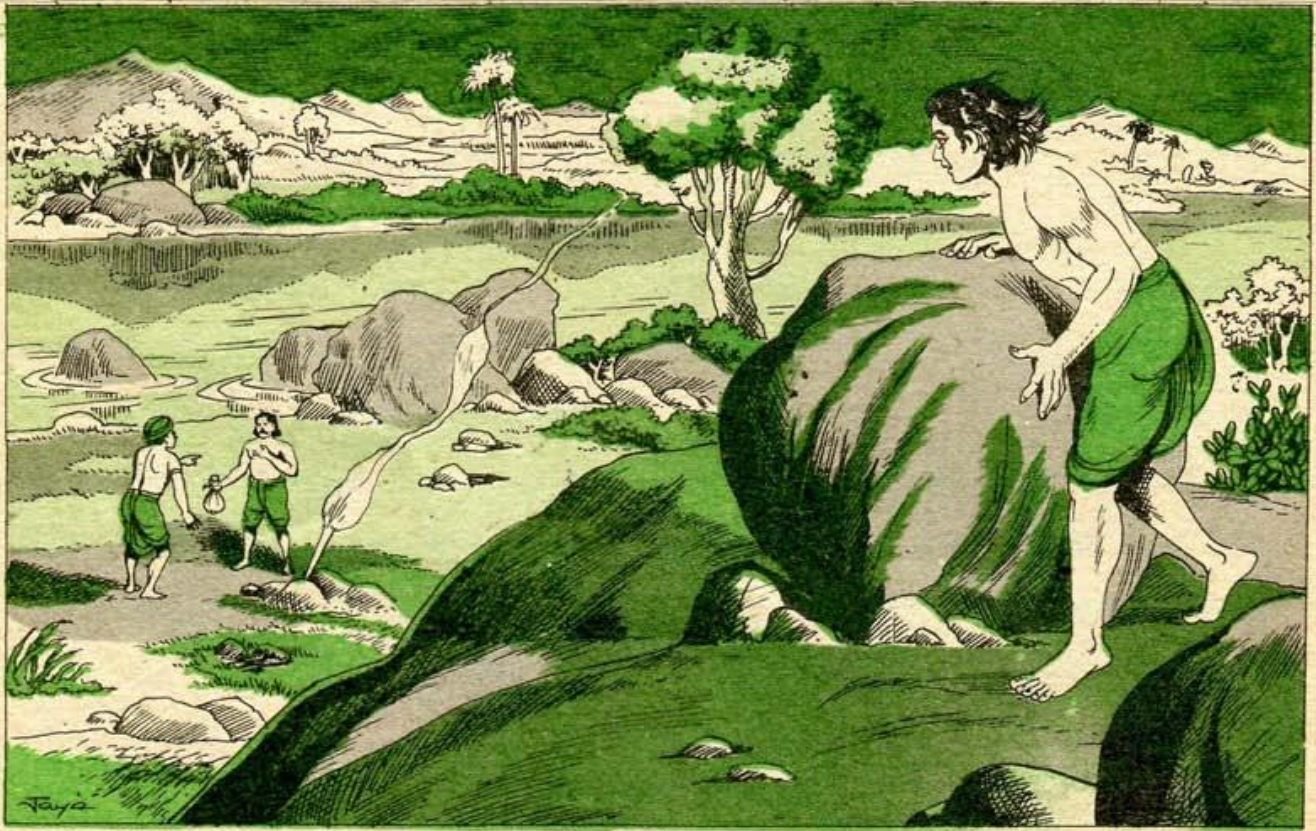
বিক্রি করে ভাল জামাকাপড় পরে শহরে গেল। ঘোড়ায় চড়ে সেই ব্যবসাদারের কাছে গিয়ে শাড়ি ও জামা দেড়হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিল।

ঐ দুটো নিয়ে সে ভাবল, এগুলো নিয়ে কি করব। ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়ল, বারকুড়ির রাজকুমারীর কথা। সে ছিল খুব সুন্দরী। সে ব্যবসাদারকে বলল, "এই দুটো ভাল করে বেঁধে সোজা গিয়ে তুমি বারকুড়ির রাজকুমারীকে দিয়ে এসো। বলে দেবে স্বর্ণরেখার সত্যবাদী রাজকুমার পাঠিয়েছে।" এই কাজটি করার জন্য সে রাহাখরচ বাবদ ব্যবসাদারকে পাঁচশ টাকা উপহার দিল।

ব্যবসাদার সুবলের কথামত শাড়ি ও জামা নিয়ে রাজকুমারীকে দিয়ে এল। রাজকুমারী শাড়ি ও জামা নিয়ে ব্যবসায়ীর হাতে একটি মুদ্রা দিয়ে বলল, "যিনি আমার জন্য এই সুন্দর উপহার পাঠিয়েছেন সেই সত্যবাদী রাজকুমারের হাতে এই মুদ্রা দিয়ে দিও।"

ব্যবসাদার রাজকুমারীর সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ঐ মুদ্রা তার হাতে দিতে গেল।

সুবল ঐ মুদ্রা না নিয়ে ব্যবসাদারকে বলল, "আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি, তাই এই মুদ্রা নিয়ে গিয়ে স্বর্ণরেখার রাজাকে দিয়ে এস।" এই কথা বলেই সুবল ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে চোখের
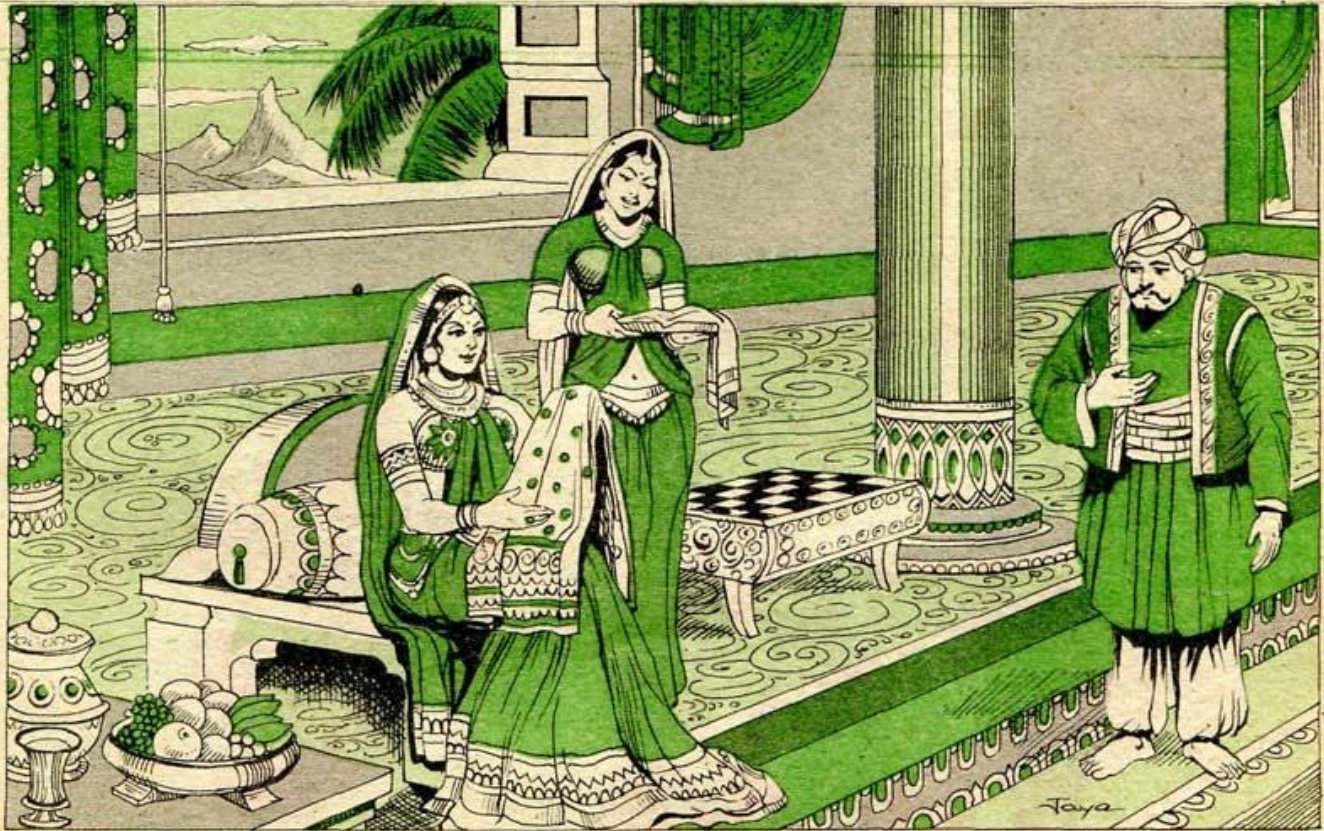
জেমসের মজার আসর
১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!
এর মধ্যে কোন্‌টি বেখাপ্পা চিত্র বলতে পারো?
1
2
3
4
5
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
শিগ্‌গির!
তোমাদের উত্তর আর
সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্‌ জেমসের
একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক
উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।
বড় হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের
উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept F-27
Post Box No. 56, Thane 400 601.
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
31-12-1977
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্‌ জেমস্‌
CHAITRA-C-69 BEN
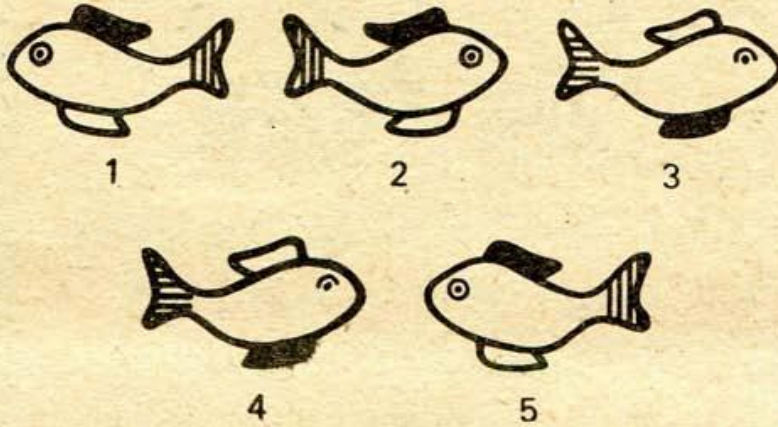
পলকে নাগালের বাইরে চলে গেল।

ব্যবসাদারের হাত থেকে মুদ্রা নিয়ে রাজা ও যুবরাজ অবাক হয়ে গেল। তারপর ব্যবসাদারের কাছে সমস্ত ঘটনা জানতে পারল। রাজার নির্দেশে ব্যবসাদার পরের দিন সুবলকে নিয়ে রাজার সামনে হাজির হল।

রাজা ও রাজকুমারের সামনে দাঁড়িয়ে সুবল সবিনয়ে দুজনকেই নমস্কার করল।

সুবলকে দেখেই রাজকুমার চিনতে পারল। সে সুবলকে বলল, "আমি তোমাকে সত্যবাদী বলেছি আর তুমি আমাকেই সত্যবাদী বানিয়ে রাজকুমারীর কাছে উপহার পাঠালে কেন?"

কিছুক্ষণ ভেবে সুবল বলল, "দেখুন, আমার একটিমাত্র সখ, তা হল ভাল জামাকাপড় পরা। এছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নাই। আমি দিন এনে দিন খাওয়ার মানুষ। তবে আমার এই সখের জন্য আমার কপালে কিছু টাকা পয়সা জুটেছে। আর সত্যি কথা বলতে আমার কপালে যা জুটেছে তার জন্য তো আপনিই দায়ী।"

রাজা সুবলের কথা শুনে ভাবল, বারকুড়ির রাজকুমারীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক এটা তো আমার মনের কথা ছেলেরও ঐ রাজকুমারীকে খুব পছন্দ। কিছুক্ষণ ভেবে রাজা বলল, "সুবল, তুমি জেনে বা না জেনে—বুঝে বা না বুঝেই যা করেছ তার ফলে এই রাজকুমারের যে লাভ হবে, আমাদের পরিবারের সবাই যে আনন্দ পাবে, তুমিও অবশ্যই তার ভাগ পাবে।"

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বারকুড়ির রাজকুমারীর সঙ্গে ধুমধাম করে স্বর্ণরেখার রাজকুমারের বিয়ে হল। আর তারপর ঐ রাজকুমারীর ছোট বোনের সঙ্গে বিয়ে হল আমাদের সত্যবাদী সুবলের।
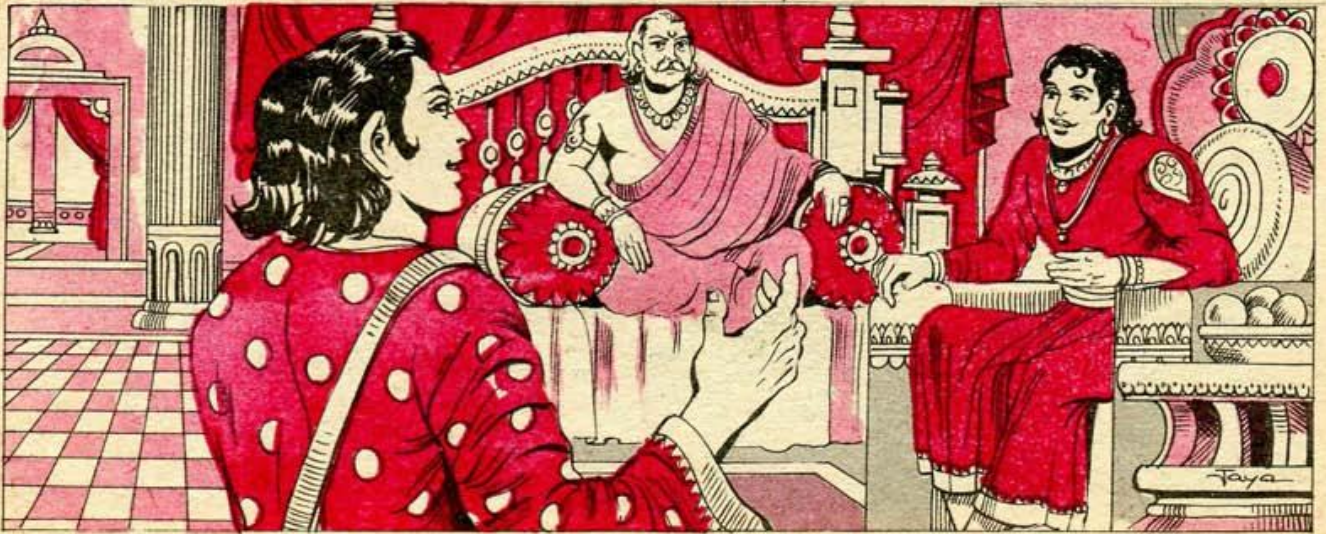
দূরদৃষ্টি

প্রাচীনকালে কান্তিপুর নগরে এক নামকরা বিচারক ছিলেন। ন্যায়বিচারের আশায় বহু দূর দূর থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে ছুটে আসত। প্রজাদের মুখে মুখে তাঁর নাম। শেষে রাজা ঐ বিচারককে অভিনন্দন জানানোর জন্য নিজেই একদিন এলেন।

রাজা এসে দেখলেন যেখানে বিচারক বিচার করছেন সেখানে ভীষণ ভীড়। তিলধারণের স্থান নেই। রাজা বিচারকের কাছে এসে বললেন, "আপনার বিচারের প্রতি এত প্রজার বিশ্বাস দেখে আমি সত্যই গর্ববোধ করছি।"

বিচারক হেসে বললেন, "এত বিচার করতে হচ্ছে যে বলার নয়। দিনকে দিন অন্যায় অবিচারের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। দেশে যাতে অবিচার না হয় সেদিকে নজর থাকলে এত প্রজা আমার কাছে বিচারের জন্য আসত না।"

তৎক্ষণাৎ রাজা বুঝতে পারলেন আসল ব্যাপার। নগরে যে কিভাবে অন্যায় অবিচার হচ্ছে তা জানার জন্য তিনি আর কালবিলম্ব না করে সেইদিনই গুপ্তচর নিয়োগ করলেন।
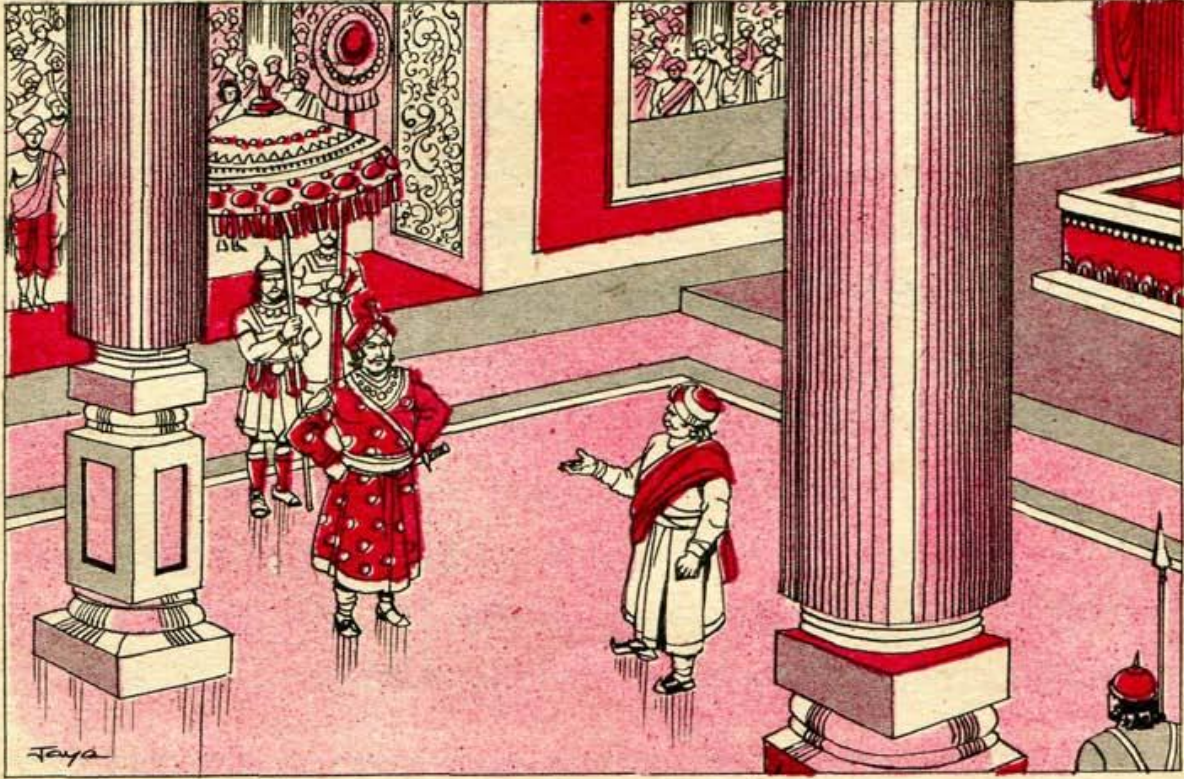
তিন বন্ধু

কোন এক গ্রামে রাম, ভীম ও সোমনাথ নামে তিন বন্ধু ছিল। তিনজনেই ধনী পরিবারের ছেলে। লেখাপড়া শিখে সুখেই জীবনযাপন করতে পারত। কিন্তু ওরা ধরাবাঁধা পথে চলতে চাইল না। নতুন কিছু করতে চাইল।

ঐ গ্রামের অদূরেই একটি অরণ্য ছিল। ঐ অরণ্যে এক সাধু ছিল। সাধু নাকি এমন সব গুহার সন্ধান দিতে পারে যেখানে অগাধ ধনসম্পত্তি আছে। তিন বন্ধু অনেক কষ্টে, বিপদ আপদের মোকাবিলা করে সেই সাধুর কাছে পেঁছাল ও তাঁকে গুহার সন্ধান জানাতে অনুরোধ করল।

সাধু ওদের বলল, "শোন, ঐ গুহার ভেতরে অনেক হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে। আজকের রাতটা তোমরা এখানেই কাটাও। কালকে ঠিক করা যাবে তোমাদের কর্মসূচী।" বলে তিনজনকে তিনটি কুটির দেখিয়ে দিল।

ওদের দেখাশোনার জন্য সাধু দায়িত্ব দিল তিনটি সুন্দরী যুবতীর উপর। ওরা সৌন্দর্যে যেন এক একটি অপ্সরা।

রাম এবং ভীমকে যে দুজন যুবতী দেখাশোনা করতে এল তাদের নাম স্বয়ংপ্রভা এবং রত্নমালা। ওদের দেখে রাম এবং ভীমের মনে হল এমন সুন্দরীকে বিয়ে করলে জীবন ধন্য হবে। গুহার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে অহেতুক হিংস্র জানোয়ারের পেটে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

পরের দিন সকালে ওরা নিজেদের কথা সাধুকে জানাল। সাধু রাজী হয়ে

রামের সঙ্গে স্বয়ংপ্রভা এবং ভীমের সঙ্গে রত্নমালাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠিয়ে দিল।

সোমনাথকেও সেবা করার জন্য এক সুন্দরী এসেছিল। কিন্তু তাতে সোমনাথের মনের কোন পরিবর্তন হল না।

সোমনাথের এই মনোবল দেখে পরের দিন সাধু তাকে গুহার সন্ধান বলে দিল।

সোমনাথ নিরাপদে গুহায় ঢুকে। যত মণিমুক্তো বহন করতে পারবে ততগুলো বেঁধে নিয়ে গ্রামে না ফিরে সোজা শহরে গেল। সেখানে সব বিক্রি করে সেই টাকায় বিরাট অট্টালিকা তৈরি করিয়ে চাকর বাকর রেখে সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

বিভিন্ন জায়গায় তিনবন্ধুর জীবন ভালভাবেই কাটছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে রাম ও ভীমের অতৃপ্তি দেখা দিল। ভীম ভাবল, আমার স্ত্রীর চেয়ে রামের স্ত্রী বেশি সুন্দরী। রাম ভাবল, ভীমের স্ত্রী সবচেয়ে বেশি সুন্দরী।

রাম ও ভীম একদিন শহরে গিয়ে সোমনাথের অট্টালিকা দেখে অবাক হল। গোটা বাড়িতে ঝি চাকর ভরে রয়েছে। বাড়িটা যেমন বিরাট তেমন সুন্দর। কোন কিছুর অভাব আছে বলে মনে হল না। তবে ওরা লক্ষ্য করল,
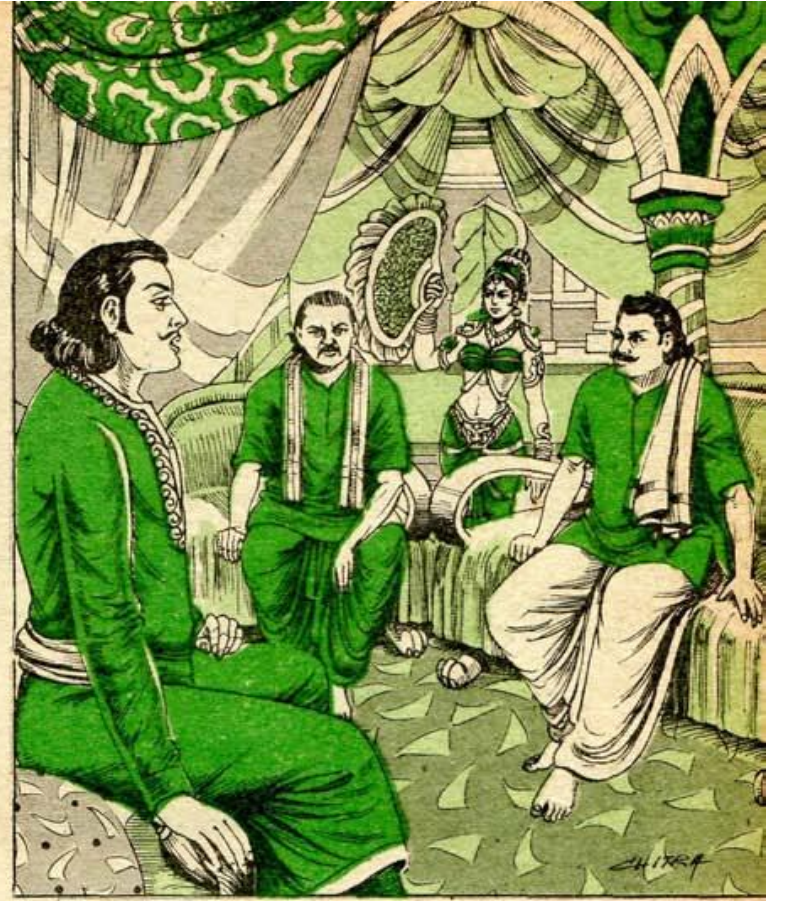
সোমনাথের মনে বা চোখেমুখেও আনন্দের কোথাও কোন ছাপ নেই।

রাম ও ভীম এক হপ্তা সোমনাথের বাড়িতে কাটিয়ে সোমনাথকে বলল, "আমরা ঐ সাধুর কাছে যাচ্ছি। সাধুর কাছে আমাদের একটু দরকার আছে।" ওদের কথা শুনে সোমনাথও রওনা হল।

তিন বন্ধুতে গেল সাধুর কাছে। সাধু ওদের মুখ দেখে মনের অতৃপ্তি বুঝল। যথারীতি ওদের তিনটি আলাদা ঘরে থাকতে বলল। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ঘরে বসে সাধু আলোচনা করল।

রাম সাধুকে বলল, "আপনি আমাকে

গুহায় পাঠালেন না। এমন কথা বললেন যে আমি ভয় পেলাম। অত্যন্ত সুন্দরীকে ভীমকে দিলেন আর আমাকে দিলেন অতি সাধারণ মেয়েকে।"

ভীম সাধুকে বলল, "সোমনাথ কত ধনসম্পত্তি পেল আমরা কিছুই পেলাম না। আর রত্নমালার না আছে গুণ না আছে রূপ। অথচ রাম কেমন সুন্দরী রূপে গুণে মেয়ে পেল।"

সোমনাথ বলল, "হে মুনিবর, ধনসম্পত্তি দিয়ে আপনি আমার শান্তি কেড়ে নিয়েছেন। আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার সম্পত্তির লোভে আমাকে এত ভালবাসছে সে বলার নয়। আত্মীয়-স্বজনদের জ্বালায় আমি মরে গেলাম। আমার জীবন বিফলে গেল।"

তারপর সাধু তিন বন্ধুকে একত্রে বসিয়ে বলল, "আমি তোমাদের কাউকে গুহায় যেতে বারণ করিনি। তোমরা যে যার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে করেছ। তোমরা সুখ চাও। সুখ যদি পেতে চাও তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়েই সুখ পেতে পার। আমার কাছে আসা কোন দরকার ছিল না। আসলে তোমাদের মনের পরিবর্তন দরকার। অন্য কেউ তোমাদের মন ঠিক করে দিতে পারে না। অন্যের চোখে যে মেয়ে সুন্দরী তাকে তোমরা সুন্দরী মনে করতে পারছ না। এটা নিশ্চয় তোমাদের যার যার মনের ব্যাপার।"

তারপর তিনবন্ধুতে ফিরে গেল। রাম ভেবে দেখল, ভীমের চোখে যদি আমার বউ সুন্দরী হয়, আমার চোখে সুন্দরী হবে না কেন? ভীমও ঐ একই কথা ভাবল। সোমনাথ পছন্দসই একটি মেয়েকে বিয়ে করল, এইভাবে প্রত্যেকে নিজেদের সমস্যা নিয়ে ভেবে নিজেরাই সমাধান করল এবং সুখের সন্ধান পেল।
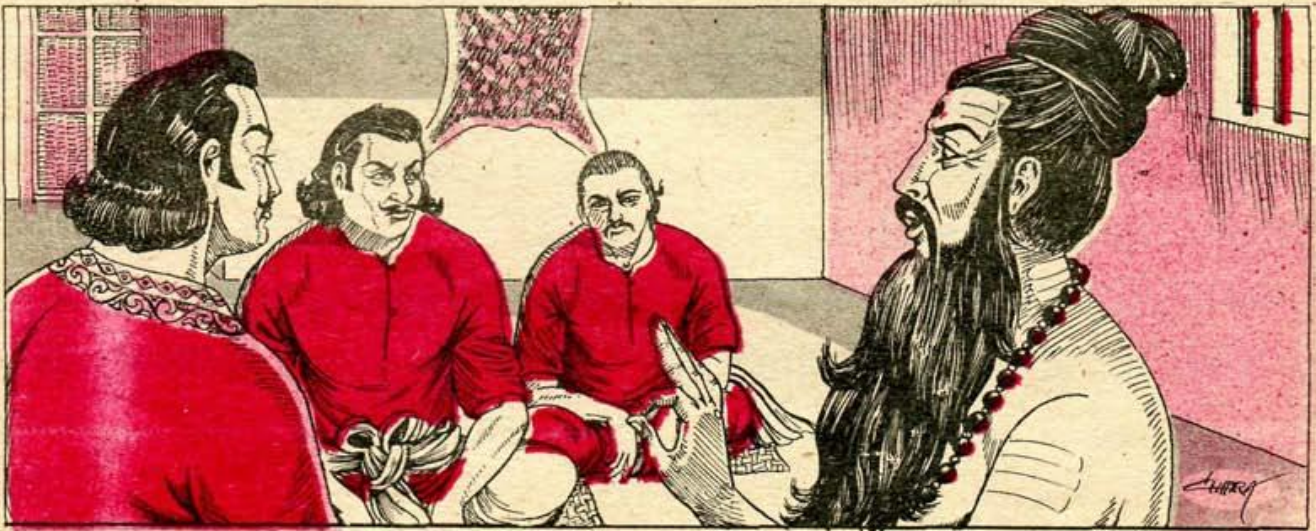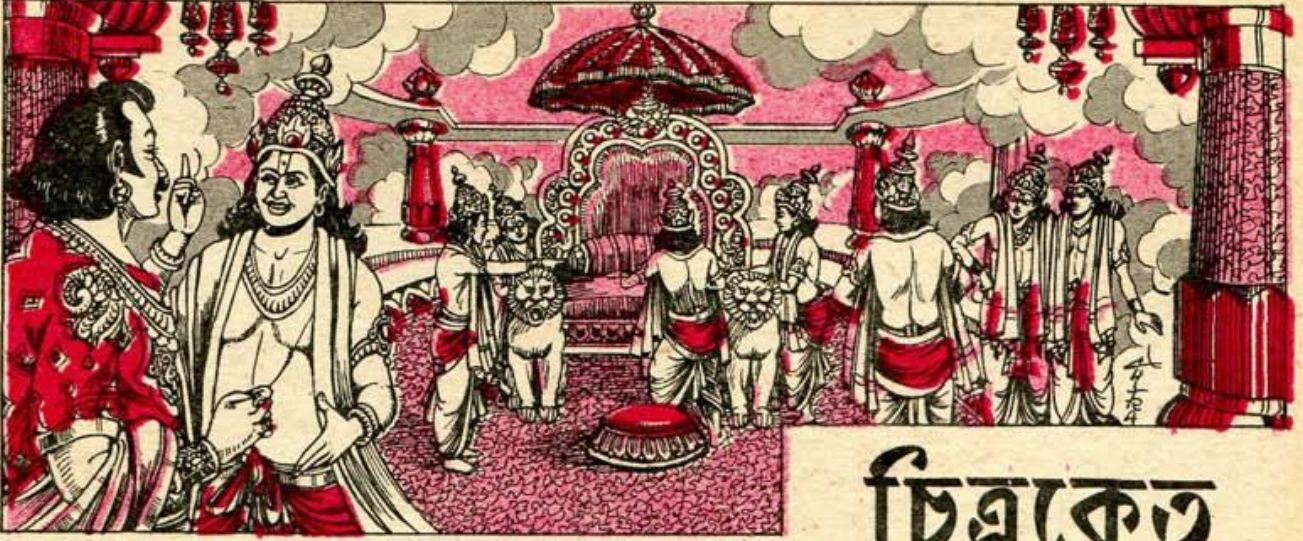
চিত্রকেতু

রাজা চিত্রকেতুর দানবীর হিসেবে খুব নামডাক ছিল। তিনি তাঁর দেশের প্রজাদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে সব সময় নজর রাখতেন। তাঁর পাশের দেশের নাম ছিল মালব দেশ। সে দেশের রাজার নাম মাধববর্মা। মাধববর্মা ছিলেন চিত্রকেতুর জন্মশত্রু। মাঝে মাঝে চিত্রকেতুর দেশ আক্রমণ করতে এসে উচিত শিক্ষা পেয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হত।

এইভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। একবার মালব দেশে দুর্ভিক্ষ হল। প্রজারা খেতে পেল না। না খেতে পেয়ে পথেঘাটে মারা যেতে লাগল। আর থাকতে না পেরে মালবদেশের প্রজারা দলে দলে রাজা চিত্রকেতুর দেশে আসতে লাগল। চিত্রকেতু তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে মালবদেশের সেনাবাহিনীও চিত্রকেতুর দেশে ঢুকে খেয়ে পরে বাঁচল। মহান রাজা চিত্রকেতু তাদেরও সাদরে গ্রহণ করে খেতে পরতে দিলেন।

একদিন রাত্রে রাজা চিত্রকেতু একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি যেন একটি বিরাট সুন্দর ভবনে আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেবতুল্য মানুষগুলো মণিমুক্তো লাগানো সিংহাসন ঐ ভবনের মাঝখানে রেখে ছোটাছুটি করছে। চিত্রকেতু ওদের ছোটাছুটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কার জন্য এত ভাল সিংহাসন এখানে রাখা হয়েছে? কে বসবেন এই সিংহাসনে?"

ওরা চিত্রকেতুকে বলল, "আমরা জানতে পেরেছি ভূলোকে মহা দানবীর রাজা একজন আছেন। তাঁর নাম

বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী

চিত্রকেতু। আমাদের বড় ইচ্ছা হয়েছে তাঁকে এখানে এনে সম্মানিত করার।"

সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকেতুর স্বপ্ন ভেঙে গেল। তাঁর দানধর্মের কথা দেবতাদের কানেও গেছে ভেবে চিত্রকেতুর মন আনন্দে ভরে উঠল। আরও দান করলে দেবতারা নিশ্চয় আরও খুশী হবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিনে একহাজার প্রজাকে সোনা দান করতে বললেন।

সোনা দান করার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই চিত্রকেতুর কোষাগার শেষ হয়ে এল। বহু প্রজা সোনা পেল বটে কিন্তু সমস্ত প্রজার উপকারের জন্য দেশে তেমন কাজ হল না। বহু প্রজা হঠাৎ সোনা পেয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ কেউ জুয়ো খেলে ফোকটে পাওয়া সোনা খরচ করে ফেলল। এত সহজে বেশ কিছু প্রজার হাতে টাকা আসায় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেল। এসব দিকে চিত্রকেতুর নজর পড়েনি। তিনি সব সময় দেবতাদের কথা ভাবতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে রাজা চিত্রকেতু আবার স্বপ্ন দেখলেন। সেই সিংহাসন, সেই মানুষগুলো। তবে এবারে সিংহাসনের পাশে ছিল একটু গোবর। সিংহাসনের ওপরে ছিল অনেকগুলো কাঁটার ঝোপ। আর তার পাশে ছিল একটি চাবুক।

রাজা এসব দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে ওরা বলল, "ভূলোকে চিত্রকেতু নামে একজন রাজা আছে, প্রজাদের প্রতি তার কর্তব্য সে ভুলে গেছে। ফলে প্রজারা কষ্ট পাচ্ছে। তাই তাকে এখানে এনে শাস্তি দেওয়া হবে।"

রাজা চমকে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভাঙ্গার পর স্বপ্নের কথা ভেবে তিনি সোনা দান করা বন্ধ করে দিয়ে আগের মতই দেশ শাসন করতে লাগলেন।

মনের শান্তি

অযোধ্যার রাজা শিশুমন্ত ভাগবৎ শুনতে ভালবাসতেন। ভাগবৎ শুনতে শুনতে তিনি বিভোর হয়ে যেতেন। একবার তিনি সপ্তাহকাল ব্যাপী ভাগবৎ গানের ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু একহপ্তা শুনেও তাঁর মন কেন তৃপ্ত হল না তা তিনি পণ্ডিতের কাছে জানতে চাইলেন। পণ্ডিত বুঝল যে রাজা তাকে শাস্তি দেবেন। সে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে আপনাকেও আলাদা একটা থামের সঙ্গে বাঁধতে বলুন। তারপর আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব।" রাজার নির্দেশে তাই হল। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত বলল, "মহারাজ, বাঁধনটা বড় শক্ত হয়েছে, আমাকে মুক্ত করুন।"

আমি তোমাকে মুক্ত করব কি করে? আমি নিজেও তো বাঁধা।" রাজা বললেন।

"মহারাজ, আপনি আমার মুখে ভাগবৎ শুনে শান্তি পেতে চান। জাগতিক কারণে আপনি যেমন বহু কষ্ট পাচ্ছেন আমিও তেমনি প্রচুর কষ্ট পাচ্ছি। আপনাকে খুশী করে টাকা রোজগার করতে চাই আমি। আর ভাগবৎ শুনে মনের শান্তি লাভ করতে চান আপনি। মহারাজ, এ জগতে একমাত্র মুক্ত মানুষই অন্যকে মুক্তি দিতে পারে।" পণ্ডিত বলল।
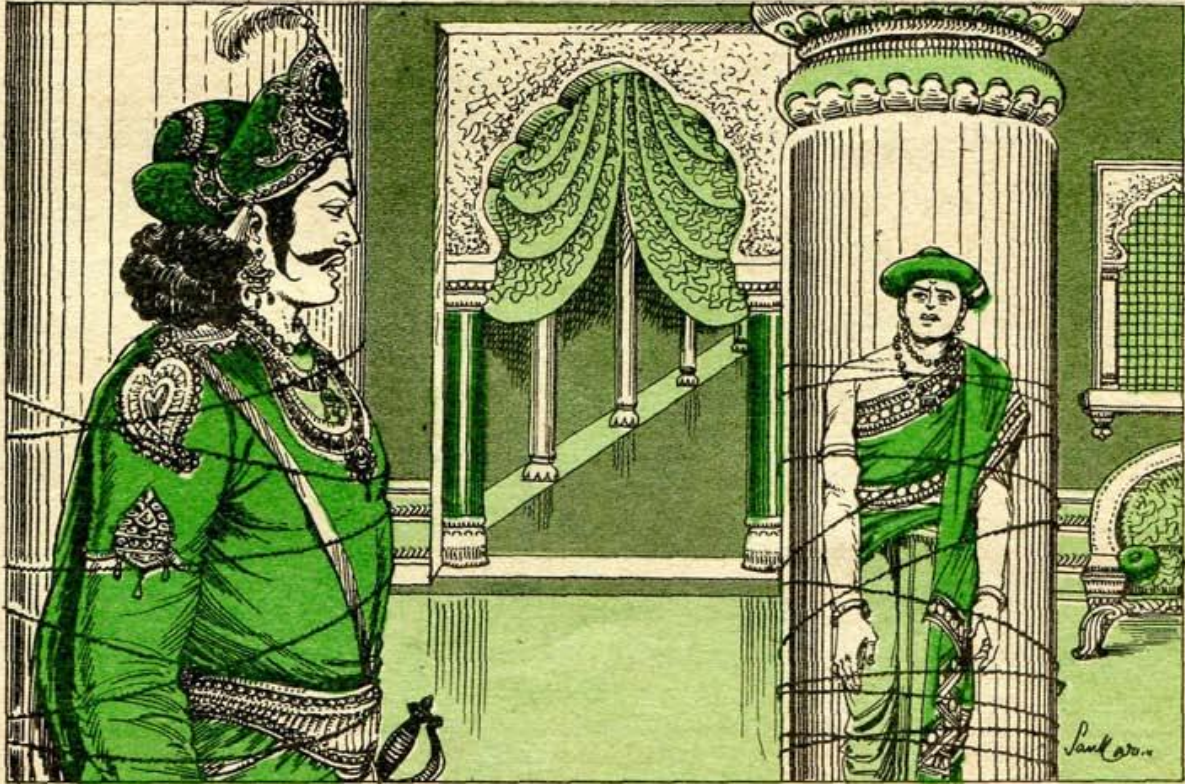
বোঝার ক্ষমতা

নন্দনপুরে মস্তবড় এক ব্যবসাদার ছিল। তার নাম রত্নাকর। তার একটিমাত্র ছেলে ছিল। নাম অজিতসেন। কায়ঙ্গ নগরে অন্য এক ধনী ছিল। তার মেয়ের নাম শিলবতী। শিলবতী যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি বুদ্ধিমতী। মেয়েটির সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেকেই রত্নাকরকে বলেছিল। রত্নাকর শিলবতীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিল। তাকে দেখে অজিতসেন মুগ্ধ। বউমার উপরে রত্নাকরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

একদিন মাঝ রাত্রে শিলবতী একটি খালি পাত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে খালি হাতে ফিরল। এটা লক্ষ্য করে রত্নাকর ভাবল, বউমা আমার সাহসী বটে, কিন্তু এইধরণের ব্যাপার চলতে থাকলে একদিন না একদিন উভয় পরিবারের নামে লোকে চুনকালি দেবে। পরদিন সকালে রত্নাকর বলল, "অজিত, বউমাকে কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে রেখে এস।"

"কেন, এখানে ওর কিসের অসুবিধে হচ্ছে ?" অজিতসেন বলল।

"আমার ধারণা, ওর বাপ-মাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিছুদিনের জন্য ও সেখানে থাক।" রত্নাকর বলল।

"আমি এখন ওদের বাড়ি যাবো না। তুমি নিয়ে যাও।" অজিতসেন বলল।

অগত্যা রত্নাকর বউমাকে নিয়ে রওনা হল। পথে একটি সরু খাল পড়ল। অল্প জল ছিল তাতে। জুতো খুলে খালি পায়ে খাল পেরোতে বলা সত্বেও শিলবতী জুতো পরেই খাল পেরোল।

প্রবীর কর্মকার

তার কথা না শোনায় রত্নাকরের রাগ হল। তবে সে রাগ প্রকাশ করল না।

কিছুদূরে যাওয়ার পর একটি ফসলে ভরা ক্ষেত পড়ল। তা দেখে রত্নাকর বলল, "এত ফসল হয়েছে!" এই ফসল বিক্রি করে ক্ষেতের মালিকের অনেক টাকা লাভ হবে।"

"খেয়ে শেষ করে ফেললে লাভ হবে কি করে? খাওয়ার পরে বাঁচলে তো বিক্রি হবে।" শিলবতী বলল।

তার বোকা বোকা জবাব শুনে রত্নাকর বিরক্ত হল। এত বোকা মেয়েকে লোকে যে কি করে এবং কেন বুদ্ধিমতী ভাবত তা সে বুঝতে পারল না।

পথে পড়ল একটি শহর। রত্নাকর বলল, "শহরটা কি সুন্দর!"

সঙ্গে সঙ্গে শিলবতী বলল, "শত্রু রাজাগুলো এই শহরটাকে ধ্বংস করে কিছু আর বাকী রাখেনি।"

আরও কিছুদূর হেঁটে একটি বটগাছের নিচে রত্নাকর বিশ্রাম করতে বসল। একটু দূরে গিয়ে বসল শিলবতী। বিশ্রাম করতে করতে রত্নাকর আপনমনে বলল, "এইধরণের একটা মূর্খ, পাজী মেয়েকে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলাম। বড়দের সম্মান দিতেও জানেনা। একে রেখে এলে ছেলের ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।"

তারপর কিছুটা পথ গাড়িতে করে
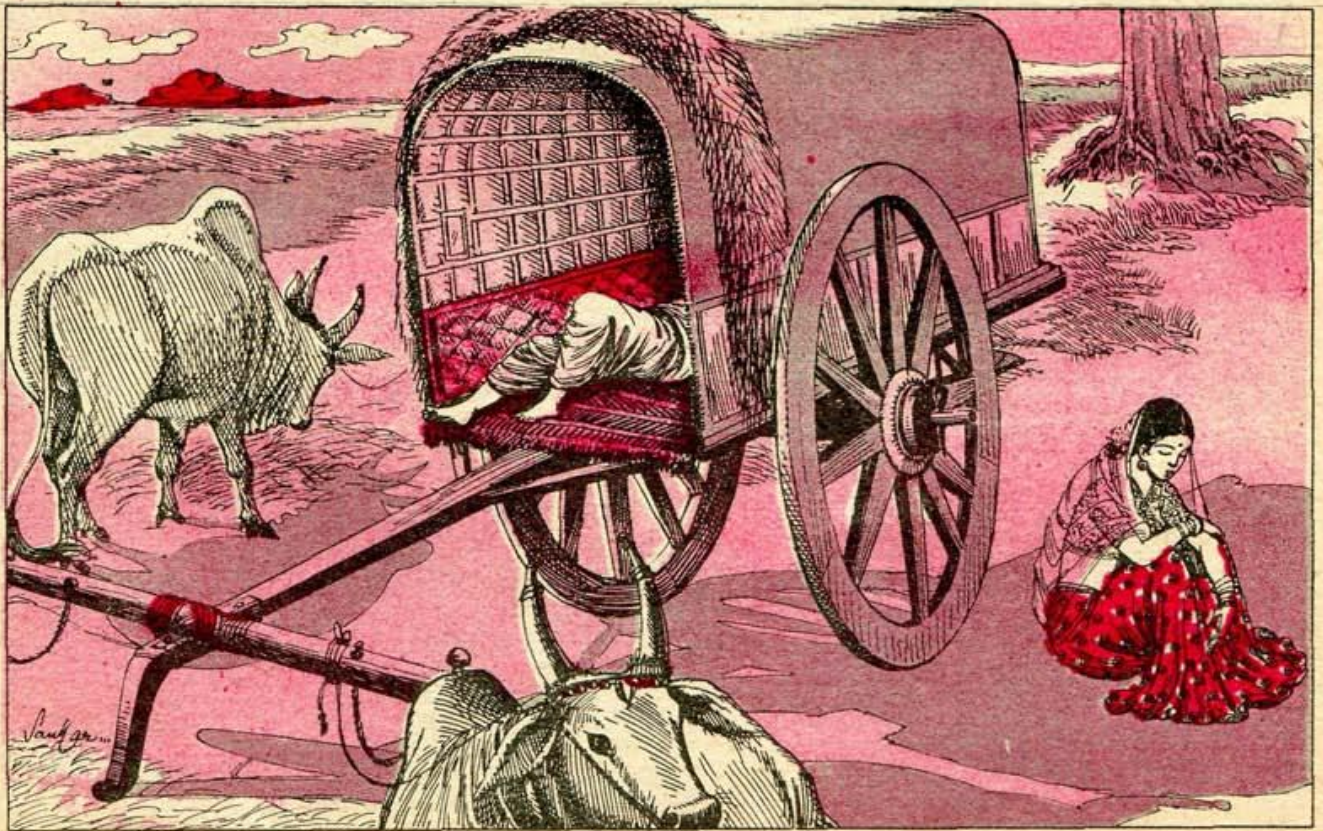
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে

মুক্তি প্রতীক্ষায়

এল. ভি. প্রসাদের

জয় বিজয়

(সিনেমাস্কোপ ও ইস্টম্যান কালার)

শ্রেষ্ঠাংশে :

জিতেন্দ্র প্রেমকিষান

রীনা রায় ও বিন্দিয়া গোস্বামী

সঙ্গীত :

রাজেশ রোশন

পরিবেশনা :

মিউজিক্যাল ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড

কলিকাতা
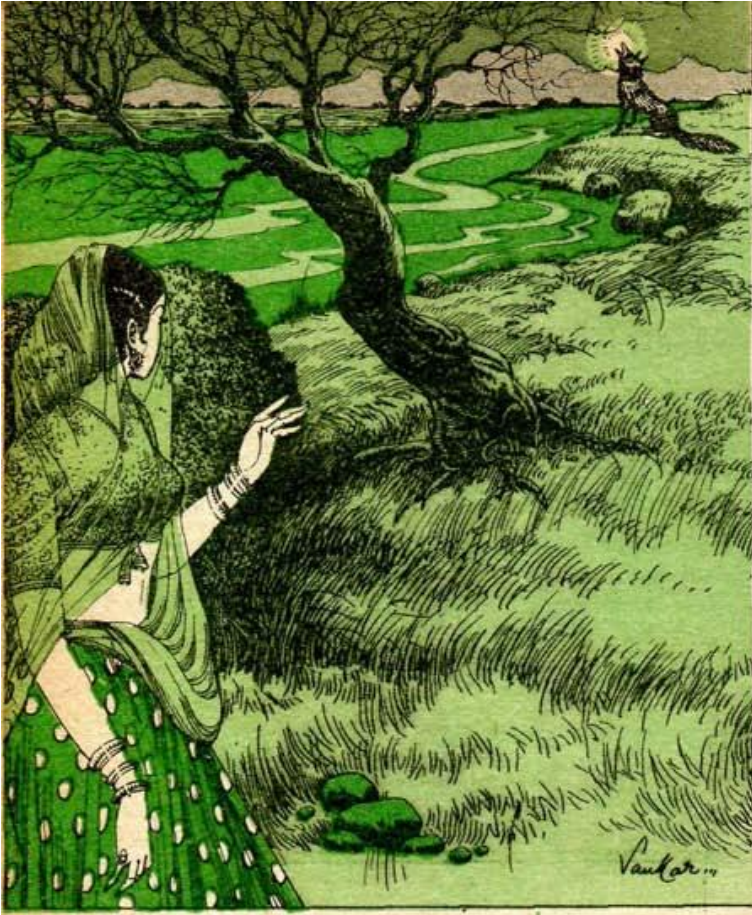
যেতে হল। পথে একজনের বাড়িতে খেয়ে গাড়ির ওপরে বিশ্রাম করল রত্নাকর আর গাড়ির নিচে ছায়ায় বসে রইল শিলবতী।

গাছের ওপর বসে একটি কাক তারস্বরে ডাকতে লাগল। শিলবতী কাককে বলল, "তুমি অত ডাকছ কেন কাক? একটি অপরাধ করায় স্বামীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আর একটি অপরাধ করলে সারা জীবনে হয়ত স্বামীর মুখ দেখতে পাবো না।"

কাকের ডাক শুনে রত্নাকরের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে প্রশ্ন করল, "কাককে তুমি কি কথা বলতে চাইছ? তোমার এসব কথার মানে কি?"

"সুগন্ধ থাকার ফলেই মানুষ চন্দন গাছ কেটে ফেলে। আমার যেসব গুণ আছে তার মধ্যে একটি হল পশুপাখির ভাষা আমি জানি।" শিলবতী বলল।

তার কথা শুনে রত্নাকর ভাবল, তার বউমার মাথা খারাপ আছে। শিলবতী আবার বলল, "কিছুদিন আগে একটি মেয়ে শেয়াল ডেকে উঠল। সে জানাচ্ছিল নদীতে একটি মহিলার শবদেহ ভেসে চলে যাচ্ছে। তার গায়ে সোনার অলংকার রয়েছে। শেয়ালের ভাষা বুঝে আমি একটি খালি পাত্র নিয়ে নদীর তীরে গেলাম। শবদেহটিকে তীরে টেনে এনে অলংকারগুলো খুলে ঐ পাত্রে রেখে মাটি খুঁড়ে ঐ পাত্রটি সযত্নে রেখে দিয়েছি। আর ঐ শবদেহটাকে শেয়ালকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বাড়ি থেকে বেরনো এবং ফেরা আপনার নজরে পড়েছিল। তাই আজ আমার এই দশা।"

রত্নাকর বউমার কথাগুলো এমনভাবে শুনছিল যেন সে কোন গল্প শুনছে। শিলবতী আবার বলল, "তবে পশুপাখিদের আমার উপর নজর আছে। অনেকক্ষণ থেকে ঐ কাক আমাকে

একটি কথা জানাচ্ছে। ঐ গাছতলায় নাকি দুটো ঘড়ায় অগাধ ধন আছে।"

শুনেই রত্নাকর ঐ গাছতলা খুঁড়ল। পেল দুটো ঘড়া। মুহূর্তে বউমার উপরে রত্নাকরের অগাধ বিশ্বাস জন্মাল। সে বউমাকে বলল, "শোন বউমা, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। আমি সত্যি দুঃখিত। চল বাড়ি ফিরে যাই।"

পথে আবার সেই বটগাছ পড়ল। রত্নাকর জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই গাছের নিচে না বসে দূরে বসেছিলে কেন?"

"বটগাছের খোপে সাপ থাকে, আর গাছের ওপর থেকে পাখিগুলো প্রায়ই নোংরা বিষ্ঠা ফেলে।" শিলবতী বলল।

"তা ঠিক, তুমি একরকম ঠিক কথাই বলেছ।" রত্নাকর হাসতে হাসতে বলল।

শহরে এসে শিলবতী বলল, "এই নগরে পথিকদের বিশ্রামের জন্য একটিও পান্থশালা নেই। একদিন বহাল তবিয়তে শত্রুরাজা দখল করে এই নগরে সুখে থাকতে পারবে।"

ফেরা পথে আবার সেই ক্ষেত পড়ল। শিলবতী বলল, "এই ক্ষেতের ফসল মালিক সব না খেয়ে যদি বিক্রি করে তবেই লাভ হবে।"

কিছুদূর যাওয়ার পর সেই সরু খাল পড়ল। খালি পায়ে না পেরোনোর কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিলবতী বলল,

"জলে অনেক রকমের পোকামাকড় থাকতে পারে। পাথরের টুকরোগুলো পায়ে গেঁথে যেতে পারে। তাই জুতো পরেই পার হওয়া ভাল।"

বউ ফিরে এসেছে দেখে অজিত খুশী হল। বাড়ির সমস্ত চাবি রত্নাকর বউমার হাতে দিয়ে দিল। বউমার উপরে বাপের এই বিশ্বাস দেখে অজিত অবাক হল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাজা দেশে কজন বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী আছে তার পরীক্ষা নিতে চাইলেন। অজিত বউকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গেল।

বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে যারা গিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে রাজা প্রশ্ন করলেন, "রাজাকে যদি কেউ লাথি মারে তাকে কি ধরণের শাস্তি দেওয়া উচিত?"

জবাবে কেউ কেউ বলল, "তাকে দেশদ্রোহীর শাস্তি দেওয়া উচিত।" আবার কেউ বলল, "চাবুক মারা উচিত।" এইভাবে নানাজনে নানা কথা বলতে লাগল। এক ফাঁকে অজিত স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে নিল এই প্রশ্নের জবাব। শিলবতী জবাবে বলল, "রাজাকে ভালবেসে মজা করে রানী লাথি মারতে পারে। আবার খেলতে খেলতে রাজাকে তার ছেলেমেয়েরাও লাথি মারতে পারে। আসলে—কে লাথি মেরেছে সেটাই হল প্রশ্ন।"

অজিত বলল, "মহারাজ, রাজাকে যে লাথি মারে তার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক আরও গভীর হওয়া উচিত।"

শুনে রাজা ঘোষণা করলেন, "অজিতসেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান।"

কিছুদিন পর অজিতসেন ঐ দেশের মন্ত্রী হল। রাজার প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে করায় মন্ত্রী হিসেবে অজিতসেনের খুব নাম হল।
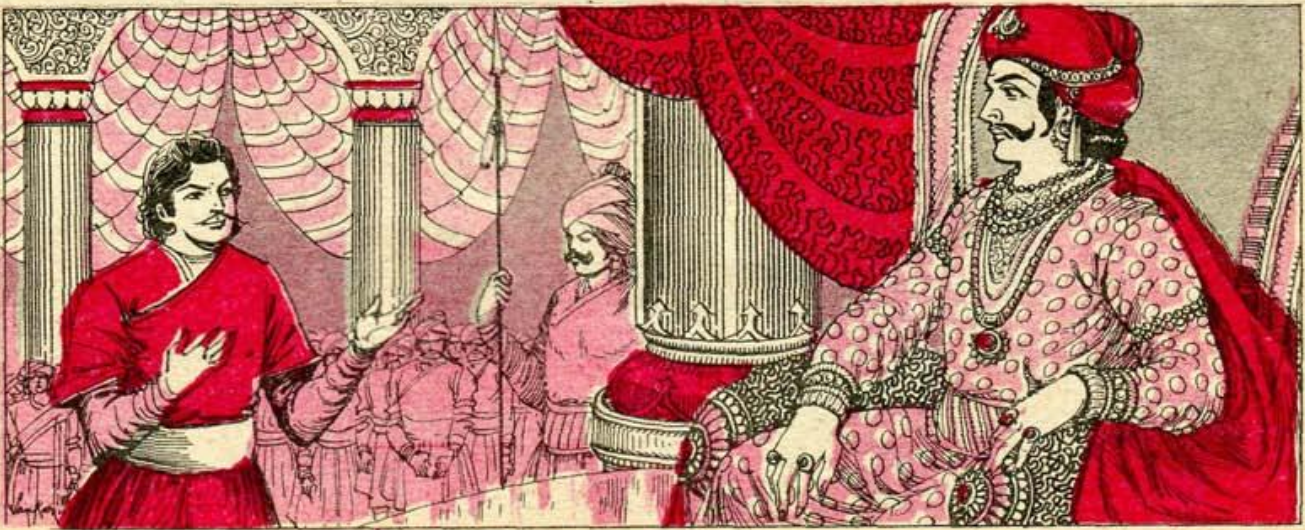
ফল চোর

কোন এক জমিদার একটি বড় আমবাগান করেছিল। যত্ন করে আমগাছগুলো দেখাশোনা করার জন্য মালি রেখেছিল। সে বছর খুব আম হয়েছিল। যেদিন আম পাড়ার কথা তার আগের দিন মালি জমিদারের কাছে এসে বলল, "জমিদারবাবু, সর্বনাশ হয়েছে। পাড়ার ছেলেগুলো বাগানে ঢুকে সমস্ত আম খেয়ে ফেলেছে।"

জমিদার তাকে কোন কথা না বলে পরদিন পাড়ার ছেলেদের ডেকে মিষ্টি খেতে দিল। ছেলেগুলো কয়েকটি মিষ্টি খেয়ে আর খেতে পারল না।

ওদের চলে যাওয়ার পর জমিদার মালিকে ডেকে বলল, "যে ছেলেগুলো দু চারটের বেশি মিষ্টি খেতে পারে না তারা গোটা আমবাগান কিভাবে শেষ করল আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

জমিদারের কথা শুনে মালির মুখ চুন হয়ে গেল। সে আর দেরী না করে তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে রাখা আমগুলো ডালয় ডালয় এনে জমিদারকে দিয়ে দিল।

কৌশল
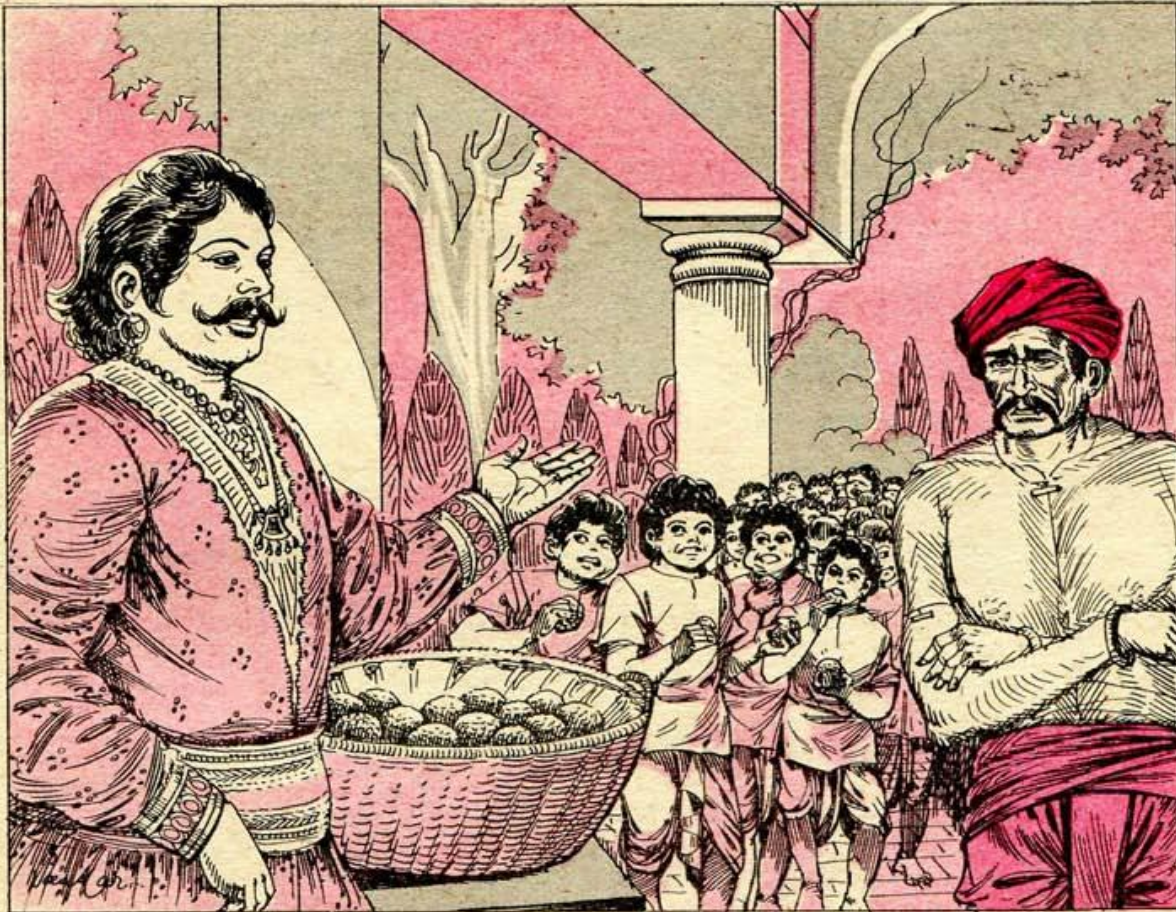
পারস্য দেশের একটি শহরে রজাক নামে এক গরীব লোক ছিল। সে এক ব্যবসাদারের দোকানে কাজ করত। মাইনে অতি সামান্যই পেত। যা পেত তাতে কোনরকমে তার ঘরসংসার চলত।

ঐ শহরে একটি চোর অল্পদিনের মধ্যেই বহু বাড়িতে চুরি করেছিল। ঐ চোরকে ধরতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়ার কথা সুলতান ঘোষণা করলেন।

একদিন রজাক রাস্তার মাঝখানেই স্ত্রীকে চিৎকার করে যা নয় তাই বলল। কিছু লোক জমে গেল। দু-একজন কারণ জিজ্ঞেস করল। ওদের প্রশ্নের জবাবে রজাক বলল, "আর বলবেন না, এই বোকা বউটাকে নিয়ে আমি মরে গেলাম। আমার শ্বশুরমশাই ওর হাত দিয়ে একটা বাক্স পাঠিয়েছে। শ্বশুরের ইচ্ছা আমি যেন ঐ বাক্সটা সুলতানকে দিই। সুলতান সেটা পেয়ে খুশী হয়ে এত পুরস্কার দেবেন যে তাতেই আমাদের জীবন কেটে যাবে। কিন্তু বউটা আমাকে বাক্সটা দিতে চাইছে না। এটা কি ধরণের মেয়েছেলে বলুন দেখি?"

জবাবে রজাকের বউ চিৎকার করে বলল, "আমার বাবার একরত্তি বুদ্ধি নেই। আমার স্বামী আরও বোকা। ঐ বাক্সে একটি কাগজ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ওটা পেলে নাকি সুলতান পুরস্কার দেবেন। এ হয় কখনো? আমি এই শেষ কথা বলে দিচ্ছি, আমার জান যায় যাক আমি ঐ বাক্স দেবো না।"

রজাক চিৎকার করে বলল, "আচ্ছা;

অনিমা দেবী

আমিও দেখে নেবো, তুমি কিরকম না দাও। ওটা তোমাকে দিতেই হবে।"

এই খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। খবরটা চোরের কানেও গেল। তারও লোভ হল ঐ বাক্সের উপর। সে ওটাকে চুরি করার উদ্দেশ্যে তক্কে তক্কে ছিল।

দুদিন পরে রজাক, না জানি কিভাবে ঐ বাক্স নিয়ে রাজধানীর দিকে রওনা দিল। চোরও তাকে অনুসরণ করল।

সারাদিন হেঁটে হেঁটে রাত্রে রজাক রাজধানীতে পোঁছাল। রাত্রে সে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিল। চোরও ঐখানে একটি ঘর নিল। রজাক পথে লক্ষ্য করেছিল যে একটি লোক তাকে অনুসরণ করছে। রজাকের সন্দেহ হল, হয়ত এই লোকটাই চোর। সে রাত্রে বাক্সটাকে নিজের কাছে রেখে খুব নাক ডেকে ঘুমোনোর অভিনয় করল।

চোর ভাবল, রজাক ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ঐ বাক্স চুরি করে সোজা, সাতসকালে সুলতানের কাছে পৌঁছে গেল। সুলতানের লোক বাক্স খুলে যে কাগজটি পেল সেটা সুলতানের হাতে দিল। সুলতান হাতে নিয়ে দেখলেন। তাতে লেখা আছে "এই বাক্স যে লোকটা আপনার কাছে নিয়ে এসেছে এই সেই চোর।" চিঠির নিচে রজাকের নাম ঠিকানা লেখা ছিল।

এতক্ষণ রজাক নিজেকে আড়ালে রেখে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। তারপর সে সুলতানের সামনে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাল। সুলতান চোরকে জিজ্ঞেস করে যত জিনিস চুরি গেছে সমস্ত জিনিসের খোঁজ পেলেন। তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য রজাককে সুলতান একহাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন। ঐ পুরস্কার ভেঙে ভেঙে খরচ করে রজাক সুখেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল।

মানুষের তৈরি দেবতা

একজন সাধুর ক্ষমতা ছিল অসীম। সেই সাধু দেশে দেশে ঘুরত। যেসব ঠাকুর দেবতার মন্দির ভেঙে যেত সেগুলো সে সারাত। এক জায়গার ভাঙা মন্দির সারিয়ে অন্য জায়গায় যেত। অনেক জায়গার মন্দিরে ঠাকুরের শক্তি কমে গিয়েছিল। সাধু সেইসব ঠাকুরের মধ্যেও অসীম ক্ষমতার সঞ্চার করত। এইভাবে একটি গ্রামের দেবী সাধুর চেষ্টায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

দেবী প্রথমেই ঐ গ্রামের মোড়লকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল, "দেখ, যুগ যুগ ধরে আমি এই গ্রামের দেবী। বহুবছর ধরে গ্রামবাসী আমাকে অবহেলা করে আসছে। আমারও কিন্তু সহ্যের সীমা আছে। অবিলম্বে যদি আমার জন্য একটি ভাল মন্দির তৈরি করে না দাও তাহলে গ্রামকে গ্রাম আমি উজাড় করে দেবো।"

ঐ মোড়ল ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করত না। সে ছিল নাস্তিক। তাই স্বপ্নের কথা কাউকে না বলে সে চুপচাপ রইল। আসলে, মোড়ল বুঝেছিল গ্রামের সবাইকে বিনাশ করার মত ক্ষমতা ঐ দেবীর নেই।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। ঐ গ্রামের যতীন সাহার বাড়িতে চুরি হল। লোকটা এমনিতেই কিপ্টে ছিল। চোর তার বাড়ির সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল। সে সোজা মোড়লের কাছে এসে অনুযোগ করল।

সেই রাত্রে দেবী আবার মোড়লকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল, "দেখ, তুমি এখনও বুঝতে পারছ না আমি তোমাকে কি

মন্টু সেন

করতে পারি। যতীন সাহার বাড়ির সব জিনিষ কোথায় আছে সত্যি সত্যি বল।"

দেবীর কথা শুনে মোড়ল একজায়গা থেকে যতীন সাহার জিনিসগুলো এনে নিজের ঘরে সযত্নে রাখল। তার চালচলন দেখে দেবী আরও রেগে গেল। দেবী বলল, "যতীন সাহার জিনিস তাকে ফেরত না দিয়ে রেখে দিয়েছ? দাঁড়াও তোমায় ভাল করে মজা দেখাচ্ছি।"

মোড়ল জোড়হাত করে দেবীকে বলল, "দেবী, রাগ করো না। এ সব আমার কাছে থাকা আর তোমার কাছে থাকা একই কথা। তুমি একটু ধৈর্য্য ধর। আমি তোমার জন্য বিরাট মন্দির তৈরি করে দেব।" তারপর আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলে মোড়ল দেবীকে তখনকার মত ঠাণ্ডা করল।

পরের দিন মোড়ল সারা গ্রামে প্রচার করে দিল, "আমাদের গ্রামের দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। কয়েক-দিনের মধ্যে তাঁর জন্য মন্দির না করে দিলে সমস্ত গ্রাম তিনি ধ্বংস করে দেবেন। আগামী একাদশীর দিন উত্তরদিকের নারকেল বাগানে তিনি মাটি ফুঁড়ে বেরোবেন।"

মোড়লের কথা যারা বিশ্বাস করল,
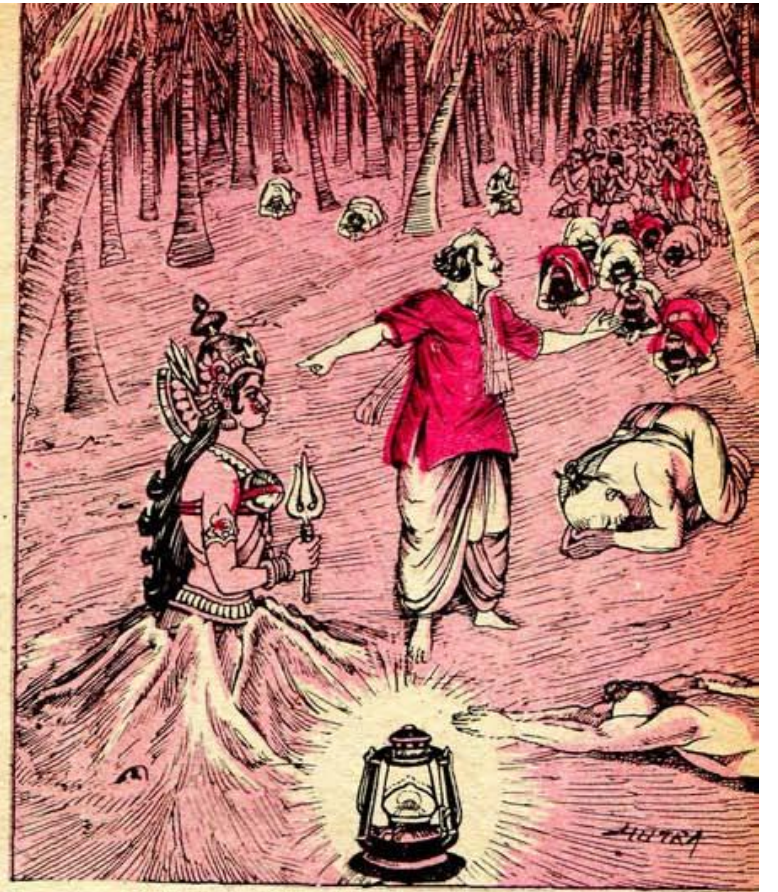
যারা অবিশ্বাস করল, সবাই মিলে একাদশীর দিন ঐ নারকেল বাগানে হাজির হল। সকলের চোখের সামনে মাটি ফুঁড়ে একটি দেবী বিগ্রহ বেরোল। তা দেখে সবাই আবেগে, ভক্তিতে দলে দলে মানত রাখতে লাগল। এ সবকিছু মোড়ল খুব ভালভাবে লক্ষ করল।

সেইদিন রাত্রে দেবী স্বপ্নে দেখা দিলে মোড়ল তাকে বলল, "দেবী, তোমার মন্দির হবেই। চাঁদা বেশি করে তুলতে পারলে তোমায় শুধু মন্দিরই নয়, সোনার গয়নাও গড়িয়ে দেবো।"

তারপর মোড়লের নেতৃত্বে চাঁদা

তোলার পালা শুরু হল। মোড়ল প্রত্যেকের কাছ থেকে জোর চাঁদা আদায় করল। গ্রামে কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি নতুন মন্দির গড়ে উঠল। দেবীর গায়েও বিস্তর গয়নাগাঁটি উঠল।

সেদিন রাত্রে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে মোড়লকে তুহাত তুলে আশীর্বাদ করল। এদিকে—ভোররাত্রে দেবীর মন্দিরে গিয়ে যে স্যাঁকরা গয়নাগুলো গড়েছিল সে দেবীর সামনে নাকমলা কানমলা খেয়ে বলল, "দেবী, মোড়লের নির্দেশে আমি তোমার জন্য যে গহনাগুলো তৈরি করেছি তার একটিও সোনার নয়, সবই নকল গয়না। কিন্তু দোহাই তোমার—আমাকে দোষ দিও না দেবী, খদ্দের যা চায় আমাকে তাই বানিয়ে দিতে হয়।"

পরমুহূর্তে দেবী মোড়লকে দেখা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও—পাজী কোথাকার, তুমি দেশবাসীকে নানা কথা বলে চাঁদা তুলে আমাকে নকল গয়না দিয়েছ? তুমি জান, আমি কে? আর—তুমি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছ তার শাস্তি কতবড়?"

মোড়ল হো হো করে হেসে বলল, "দেবী, তোমার তো প্রকাশ্যে কথা বলার ক্ষমতা নেই। তুমি যে আজকালকার দিনে কি করতে পার ভেবে পাচ্ছি না। আমি যা করেছি স্বজ্ঞানে করেছি। কোন পাপ করিনি। লোকে মন্দির কেন গড়ে? যাতে অন্য লোক সেখানে এসে মানত দেয়, সুখতুঃখের কথা বলে এই তো? যা করে দিয়েছি তার ফলে তুমি এখানে অনেক বছর সেবা পাবে। আর তোমার জন্যে যে এত করেছি, নিজের জন্যে কিছু করব না? তুমি যেমন নিজের স্বার্থের জন্য স্বপ্নে দেখা দিয়েছ তেমনি আমিও নিজের স্বার্থের জন্য মন্দির গড়ে দিয়েছি।" দেবী এই ধূর্ত মোড়লের কথা শুনে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।
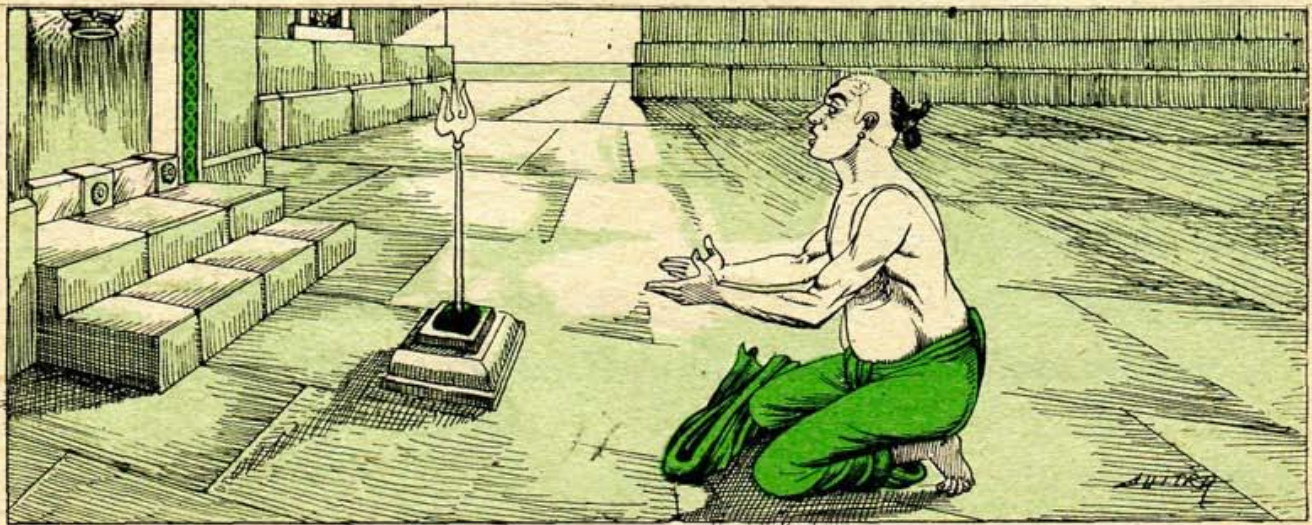
ফল

গোলকোণ্ডার নবাব লোকজন নিয়ে অরণ্যে গিয়েছিলেন শিকার করতে। দুপুর বেলায় মানুষ এবং ঘোড়ার সকলেই খিদে ও তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠল।

নবাবের লোক চারদিকে জলের খোঁজ করেও না পাওয়ায় ওদের ওপর নবাবের ভীষণ রাগ হল। কিন্তু জল না হলে তো এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নবাব যতই রাগারাগি করুন, সবাই মাথা নিচু করে চুপচাপ ছিল। নবাব চিৎকার করে বললেন, "যাও ঐ পাহাড়ের উপরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখ! জল নিশ্চয়ই আছে।"

ওরা পাহাড়ের উপরে উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। অনেক দূরে একটি কুঁড়েঘর ওরা দেখতে পেল। একজন সাধু গাছে জল দিচ্ছে। এসব দেখে নবাবের লোক তাঁকে জানাল। শুনেই নবাব ঘোড়া ছুটিয়ে তীব্রবেগে সেদিকে চলে গেলেন। নবাব দেখলেন সত্যি সত্যি একজন সাধু গাছে গাছে জল ঢালছে। নবাবকে দেখে সাধু ভাবল, কোন এক পথিক। সাধু নবাবকে চিনত না। তাঁকে একটি গাছের ছায়ায় বসাল সাধু। ততক্ষণে নবাবের লোক পৌঁছে গেল। সাধু পাতার মোড়কে করে জল এনে নবাবকে খেতে দিল। সেই জল খেয়ে নবাবের মনে হল যেন ডাবের জল। তৃষ্ণা মেটার পর নবাবের চোখ পড়ল একটি ডালিম গাছের উপর। বড় বড় ডালিম দেখে নবাব অবাক হলেন। অত বড় ডালিম নবাব কোনদিন চোখে দেখেননি।

জগন্নাথ দাস

চাঁদমামা

সংস্থাপক : চক্রপাণি
সম্পাদক : বি. নাগিরেড্ডি

এবারের বেতাল কথার নাম 'সাঁকো'। কোন এককালে দু দেশের মধ্যে একটি সাঁকো ছিল। একদিন স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার ফলে দুই দেশের রাজাই ঐ সাঁকো ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু আবার ভাঙা সাঁকো জোড়া লাগল। সব কথা জানতে হলে পড়তে হবে 'সাঁকো'। এক রাজা দুহাতে সোনাদানা দান করেও শান্তি পেলেন। 'চিত্রকেতু' কাহিনীতে সব জানা যাবে। তিনবন্ধু সুখের সন্ধানে বেরিয়ে এক সাধুর কাছে যা চাইল তাই পেল। কিন্তু তবু তারা কেউই সুখী হল না। কেন হল্না? জানতে হলে পড়তে হবে 'তিনবন্ধু'।

খণ্ড ৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭ সংখ্যা ৬

প্রতি সংখ্যা ১'২৫ : : বাৎসরিক চাঁদা ১৫'০০

নবাব ঐ ডালিমের প্রশংসা করলেন। তাঁর কথা শুনে সাধু একটি ডালিম পেড়ে তার রস নবাবকে পান করতে দিল।

সেই রস পান করে নবাব অমৃত পান করার আনন্দ পেলেন। তারপর তার মাথায় নানা ধরনের চিন্তা খেলতে লাগল।

তিনি ভাবলেন, এই উদ্যান থেকে সাধু নিশ্চয় অনেক টাকা রোজগার করে। রোজগারের অনুপাতে কর দেয় কিনা খোঁজ করতে হবে। এই ধরনের কথা কিছুক্ষণ ভেবে নবাব আর একটি ডালিমের রস পান করতে চাইলেন। কিন্তু এবারে তিনি আগের অর্ধেক রস পেলেন। নবাবের কৌতূহল জাগল। তিনি সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আগের ফল আর এইটা একই পরিমাপের হওয়া সত্ত্বেও এতে রস এত কম কেন?"

সাধু সবিনয়ে বলল, "আগের ফলের রস যিনি খেয়েছেন তিনি এবং এখনকার ফলের রস যিনি খেয়েছেন এই দুজন লোক হয়ত এক ব্যক্তি নন।"

"তা কি করে হয়? আমিই তো খেয়েছি।" নবাব জবাব দিলেন।

"তা কি হয়? কারণ ফলের রস মিথ্যা নয়। আপনি ভেবে দেখুন দুটো ফলের রস খাওয়ার মাঝে আপনার কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা?" সাধু বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল।

তখন নবাব ভাবলেন, "আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। আমার উচিত ছিল ফলের রস খেয়ে প্রশংসা করা। রস খাবার আগে যে 'আমি' রস খাওয়ার পরে সেই 'আমি' রইলাম না। আমি আয়কর সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। মনের পরিবর্তনের জন্যই ফলের রসের পরিবর্তন ঘটেছে।"

তারপর নবাব সাধুকে আর কিছু না বলে রাজধানীতে ফিরে গিয়েই ফলের উপর থেকে কর তুলে দিলেন।

রামের কথা শুনে, সেখানে যারা ছিল তারা ভীষণ ভয় পাচ্ছিল। তাদের চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল। রাম এই ধরণের কথা যে কোনদিন বলবেন তা সীতা কোনদিন ভাবতে পারেননি। তাঁর খুব দুঃখ হয়েছিল। তিনি আর সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

চোখের জল মুছে তিনি রামের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে বীর, আপনি যে কেন এই ধরণের কথা বলছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। যারা অজ্ঞ, বিবেকহীন তারা স্ত্রীকে এই ধরণের কথা বলে থাকেন। এই ধরণের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। আপনি যা ভাবছেন এই ধরণের ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি। প্রয়োজন হলে আমি যে কোন পরীক্ষা দিতে পারি। কয়েকটি নারী খারাপ থাকতে পারে কিন্তু তার জন্য প্রত্যেকটি নারীকে সন্দেহ করা অনুচিত। আমার স্বভাবচরিত্র যদি আপনি জেনে থাকেন, তাহলে আমাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার শরীরের ছোঁয়া যদি আমার শরীরে লেগে থাকে তার জন্য আমি দায়ী নই। আমি তখন অসহায় ছিলাম। আমার শরীর তার খপ্পরে থাকলেও আমি সর্বক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম। এত

বছর একসঙ্গে কাটিয়ে আজকে কি নতুন করে আমার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপনাকে জানাতে হবে ? এত বছরে যদি না জেনে থাকেন, আমাকে না চিনে থাকেন তাহলে আর কোনদিন চিনতে পারবেন না। আমাকে ত্যাগ করার চিন্তাই যখন ছিল, তখন আমার খোঁজ করতে হনুমানকে পাঠালেন কেন ? হনুমানকে দিয়ে এই ত্যাগের খবর পাঠিয়ে দিলে আমি সেদিনই প্রাণত্যাগ করতাম। আমার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আপনাকে আর যুদ্ধ করতে যেতে হত না। বন্ধু ও সাহায্যকারী নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে এত কষ্ট সহ্য করার কোন প্রয়োজন হত না।"

তারপর সীতা লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "লক্ষ্মণ, আমার জন্য চিতা সাজাও। আমি চিতায় জ্বলেপুড়ে প্রাণত্যাগ করব। এই ধরণের অপমানজনক কথা শোনার পর বাঁচার আর আমার ইচ্ছা নেই। এত লোকের সামনে স্বামী যখন আমায় ত্যাগ করেছেন তখন আমার বাঁচা মরা সমান। তাই আমি আর বাঁচতে চাই না।"

সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণের দুঃখ হল। তিনি রামের দিকে তাকালেন। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হল না যে চিতা সাজানোর ব্যাপারে তার কোন আপত্তি আছে। অগত্যা লক্ষ্মণ সীতাদেবীর ইচ্ছা অনুসারে চিতা সাজালেন।

চিতা দাউদাউ করে জ্বলছিল। মাথা নিচু করে রামকে প্রদক্ষিণ করে চিতার সামনে দাঁড়িয়ে সীতা বললেন, "আমার মন রাম ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার কথা যদি সত্য হয় তাহলে হে অগ্নিদেবতা, আমায় রক্ষা কর। আমি যে পতিব্রতা নারী তা যদি সূর্য, বায়ু, চন্দ্র, ভূমি, দেবতারা স্বীকার করেন তাহলে অগ্নিদেবতা, তুমি আমায় রক্ষা কর।" বলতে বলতে চিতা প্রদক্ষিণ

করলেন সীতা। তারপরেই তিনি দাউ দাউ জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করলেন।

সেই সময়, সেখানে যারা উপস্থিত ছিল, সবাই হা হা করে উঠল। রামের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াল।

হঠাৎ চিতা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। মাঝখানে থেকে অগ্নিদেবতা মানুষের রূপ ধরে সীতাকে তুলে চিতার বাইরে এলেন। সীতার শরীরে আগের মতই সমস্ত গয়নাগাঁটি ছিল, তাঁর পরণে যে লাল শাড়িটা ছিল তাতে একটুও আঁচ লাগেনি। সীতার একরাশ কুচকুচে কালো চুলের একটিও আগুনে পুড়ল না। চোখেমুখে আগুনের আঁচ একদম লাগেনি।

অগ্নিদেবতা রামকে বললেন, "রাম, এই নাও তোমার স্ত্রী সীতাকে। সীতার জীবনে কোন পাপ নেই। তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে সীতা গ্রহণ করেনি। রাবণ একে অন্তঃপুরে রেখেছিল, ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের পাহারা দেওয়ার জন্য এর চারদিকে রেখেছিল। রাক্ষসরা সীতাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়েছিল। তবু সীতা রাবণের কাছে নতি স্বীকার করেনি। তাই আমার নির্দেশ, সীতাকে গ্রহণ কর।"

অগ্নিদেবতার কথা শুনে রামের খুব আনন্দ হল। পরক্ষণেই এহেন পবিত্র

সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বাধ্য করায় তিনি অনুতপ্ত হলেন। তাঁর চোখে জল দেখা দিল। তিনি অগ্নিদেবতাকে বললেন, "সীতার মধ্যে যে কোন পাপ নেই আমি তা বিশ্বাস করি। সীতা বহুকাল রাবণের খপ্পরে ছিল, কোনরকম পরীক্ষা না করে আমি যদি গ্রহণ করি তাহলে লোকে বলত, 'দশরথ মহারাজের পুত্র রাম মূর্খ। রাম কামুক। ধর্ম কাকে বলে সে জানে না।' আরও কত কথা বলত। এখন তিনটি লোকের সবাই জেনে গেল। স্ত্রীলোকের সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সীতার অগ্নিপ্রবেশ দেখছিল। সবাই চুপ করে

ছিল। সীতা যে আমাকেই ভালবাসে তা আমি জানি এবং আর কেউ যে জানেনা তা নয়। আমি এখন আপনার নির্দেশ মাথা নত করে পালন করব।"

ঠিক সেই স্বর্গ থেকে দিব্যবিমানে করে দশরথ এলেন। তাঁকে দেখে রাম ও লক্ষ্মণ প্রণাম করলেন। দশরথ রামকে বললেন, "বাবা রাম, তোমাকে ছেড়ে গিয়ে স্বর্গেও সুখ পাইনি। দেবর্ষিগণ আমাকে যথেষ্ট গৌরব দান করেছেন। বনবাসের জীবন যাপন করে শত্রুকে পরাজিত করে তুমি এসেছ। তোমাকে দেখে আমার মন খুব আনন্দিত হচ্ছে। কৈকেয়ীর জন্য আমি তোমাকে বনে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন আমি জানতে পেরেছি, তোমাকে দিয়ে রাবণকে বধ করার জন্যই দেবতারাই এত কাণ্ড করলেন। তুমি এখন ফিরে গেলেই কৌশল্যা খুব খুশী হবে। তুমি এখন সোজা ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বস। লক্ষ্মণ তোমাকে যথারীতি সাহায্য করবে।"

রাম হাতজোড় করে দশরথকে বললেন "আমাকে বনে পাঠাতে বাধ্য করায় আপনি কৈকেয়ী ও ভরতকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এখন আপনি অনুগ্রহ করে অবিলম্বে তাঁদের গ্রহণ করুন।"

দশরথ রামের কথা মেনে নিয়ে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে সীতার কাছে গিয়ে বললেন, "রাম তোমাকে ত্যাগ করবো বলেছে বলে তুমি রাগ করো না।" এই কথাগুলো বলে দশরথ আবার স্বর্গে ফিরে গেলেন।

পরে ইন্দ্র রামের কাছে এসে যে কোন বর চেয়ে নিতে বললেন। রাম বললেন, "আমার সঙ্গে যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হত অথবা আহত হয়েছে তাদের সুস্থ করে তুলুন, বাঁচিয়ে দিন।" ইন্দ্র রামের অনুরোধ রক্ষা করার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরক্ষণেই আহত বা নিহত বানরগুলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে সমস্ত বানর অবাক হয়ে গেল।

সেই রাত্রে সবাই নিশ্চিন্তে, মহানন্দে ঘুমোলো। সকালে বিভীষণ রামের কাছে এসে জানালেন যে তাঁদের স্নানের সুগন্ধ জল, পরিধানের বস্ত্র সব তৈরি আছে।

রাম বিভীষণকে বললেন, "সুগ্রীব প্রভৃতি বীরদের স্নানের ব্যবস্থা আগে হোক। আমার আর এখানে থাকার সময় নেই। আমি ভরতকে কথা দিয়েছি, শপথ করেছি তার কাছে চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার পরের দিন অযোধ্যায় ফিরে যাব। আমি না গেলে ভরত তার পরের দিনই আগুনে ঝাঁপ দেবে। এখন আমার কাছে স্নান বড় কথা নয়, ভরত যাতে কোনো প্রকারেই আত্মহত্যা না করে এখন সেটা দেখাই আমার প্রধান কর্তব্য।

জবাবে বিভীষণ বলল, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। একদিনের মধ্যে আপনাকে অযোধ্যায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। কুবেরের কাছ থেকে রাবণ যে পুষ্পক বিমান ছিনিয়ে নিয়েছিল সেটা এখন আমার হাতে আছে। এই বিমান যে কোন জায়গায়
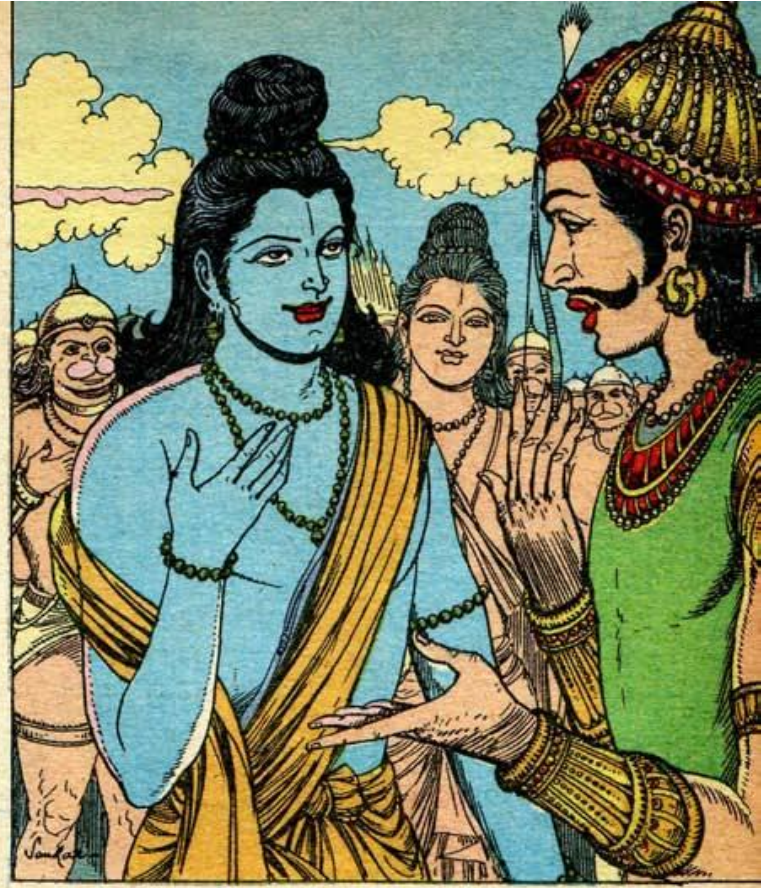
অত্যন্ত অল্প সময়ে উড়ে যেতে পারে। আমি আপনাদের আপ্যায়নের যে ব্যবস্থা করেছি তা আপনি, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন এটাই আমার বিনীত অনুরোধ।"

রাম বললেন, "বিভীষণ, যুদ্ধে আমি যে সাহায্য পেয়েছি সেটাই তো বড় ধরণের আপ্যায়ন। ভরতকে দেখার জন্য আমার মন ছটফট করছে। এছাড়া আমার মা, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে দেখতে খুব আগ্রহী। আমার মন চাইছে বন্ধু ও দেশবাসীকে দেখতে। তাই তাড়াতাড়ি পুষ্পক বিমান আনাও।

আর কালমাত্র বিলম্ব না করে আমি ঐ বিমানে চলে যেতে চাই। আমাকে অবিলম্বে বিদায় দাও।"

বিভীষণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পক বিমান এনে দিল। তারপর ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে রাম বললেন, "বানরদের কাছ থেকে আমি যে সাহায্য পেয়েছি তা ভাষায় বোঝানো যায় না। তাদের অলংকার ও বস্ত্র দিয়ে সসম্মানে বিদায় দাও। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে ওরা খুব খুশী হবে। বানরগণ না থাকলে আমার পক্ষে জয়ী হওয়া আর তোমার পক্ষে সিংহাসনে বসা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।" বিভীষণ রামের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কথা দিল। তারপর সীতাকে নিয়ে রাম পুষ্পক বিমানে উঠলেন। ওদের পেছনে উঠলেন লক্ষ্মণ। বিদায়ের বেলায় রাম বানরদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের জন্য আমি জয়ী হতে পেরেছি। এখন তোমরা যে যেদিকে ইচ্ছা যেতে পার। হে সুগ্রীব, তোমর সাহায্য ছাড়া যুদ্ধে জয়ী হওয়ার কথা কল্পনা করতে পারিনা। ওদের নিয়ে গিয়ে ভালভাবে শাসন কর। বিভীষণ অনেক কষ্টে সিংহাসন লাভের চেষ্টা সফল হয়েছে তোমার। ভালভাবে প্রজাদের সেবা করে রাজ্যশাসন কর। এটাই আমার কাম্য। এখন আমাদের তাড়াতাড়ি অযোধ্যা যেতে হবে। তাই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় চাই।"

রামের কথায় বানরগণ বিভীষণ যা বললেন তার সার হল—আমরাও অযোধ্যায় যেতে চাই। আপনার অভিষেক উৎসব দেখতে চাই। আমরা কৌশল্যা দেবীকে প্রণাম করে আসতে চাই।

"তোমরা যে যেতে চাইছ এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। সুগ্রীব, তুমি তোমার এই বাহিনীকে নিয়ে চলে এসো এই বিমানে। বিভীষণ তুমি তোমার
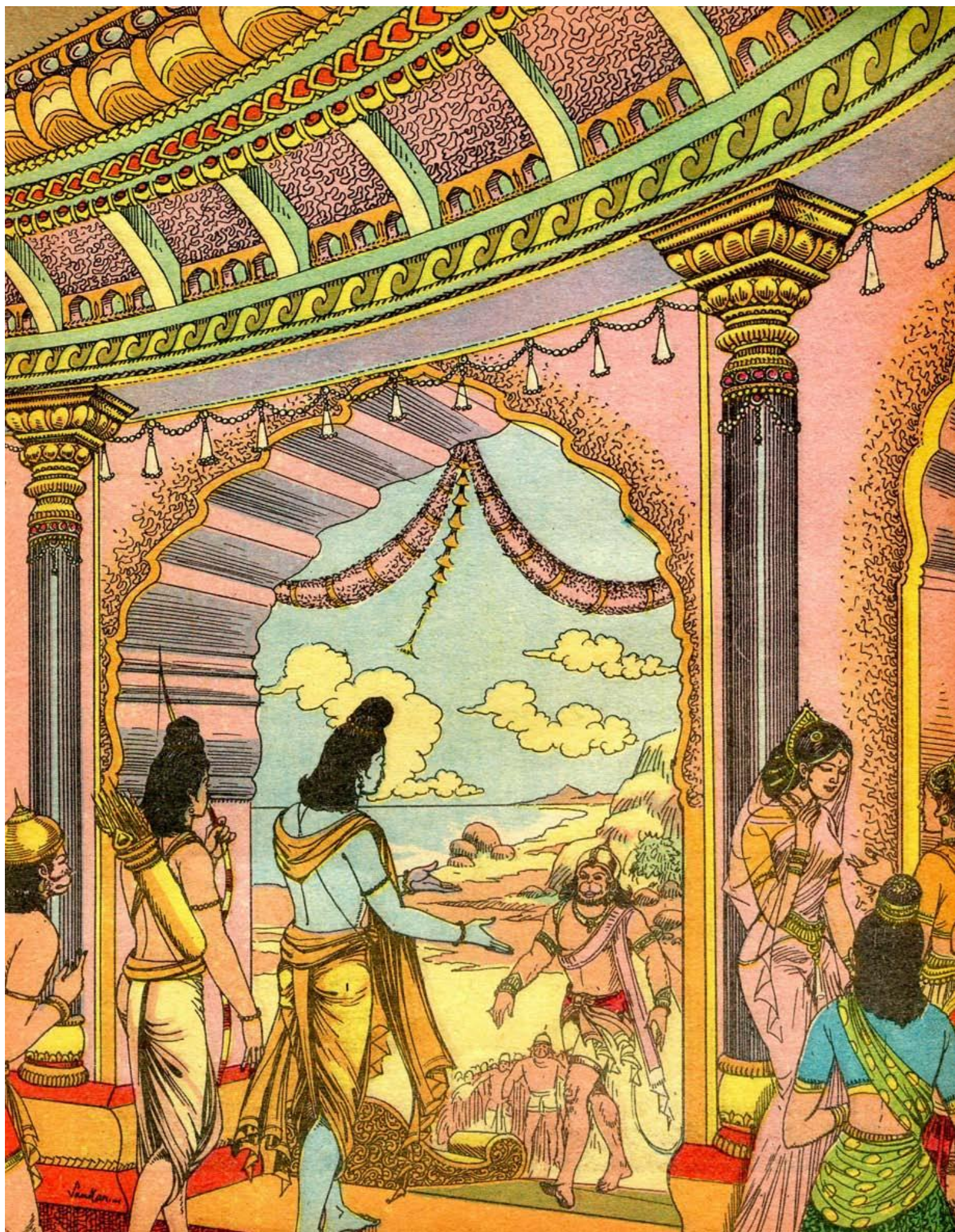
মন্ত্রীদের নিয়ে এই বিমানে চলে এসো ভাই।" রাম সস্নেহে বললেন।

বিমান আকাশে উঠল। রাম সীতাকে ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিত লঙ্কানগরী আকাশ থেকে দেখালেন। রক্তে ভেজা যুদ্ধভূমিও তিনি দেখালেন সীতাকে। রাবণকে যেস্থানে তিনি বধ করেছিলেন সেই স্থানও তিনি সীতাকে দেখালেন। এছাড়া কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরদের যেখানে মারা হয়েছিল সেসব জায়গাগুলোও সীতা দেখলেন। বিমানে যেতে যেতে রাম, যেখানে বালিকে মেরেছিলেন, সেই স্থানটিও সীতাকে দেখালেন।

সীতা রামকে বললেন, "সুগ্রীবের স্ত্রীসহ বীর বানরদের স্ত্রীদের অযোধ্যায় নিয়ে যেতে আপনাকে অনুরোধ করছি।"

রাম পুষ্পক বিমানটিকে কিষ্কিন্ধ্যায় একটুক্ষণের জন্য থামিয়ে সুগ্রীবকে বললেন, "তোমার স্ত্রীসহ অযোধ্যায় অন্য যারা যেতে চায় তাদের নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসো এই বিমানে।"

সুগ্রীব তার স্ত্রী তারার কাছে গিয়ে বলল, "তোমাকে এবং অন্য বীর বানরদের স্ত্রীদের অযোধ্যায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন সীতাদেবী সুতরাং তোমরা সবাই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

তারা সেজেগুজে অন্যান্য বানরদের স্ত্রীদের কাছে গিয়ে বলল, "চল, অযোধ্যায় ঘুরে আসি।"

শুধু অযোধ্যা নয় সীতাকে দেখার কৌতূহলও যাদের মনে ছিল তারাও আনন্দের সাথে রওনা হল। বিমানে যেতে যেতে যেসব জায়গায় বিশেষ বিশেষ ঘটনা রামের সঙ্গে ঘটেছিল সেইসব জায়গাগুলো রাম সীতাকে দেখাতে লাগলেন।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত স্মরণীয় স্থানগুলোর উপর দিয়ে বিমান দ্রুত-গতিতে অবশেষে অযোধ্যায় পৌঁছাল।
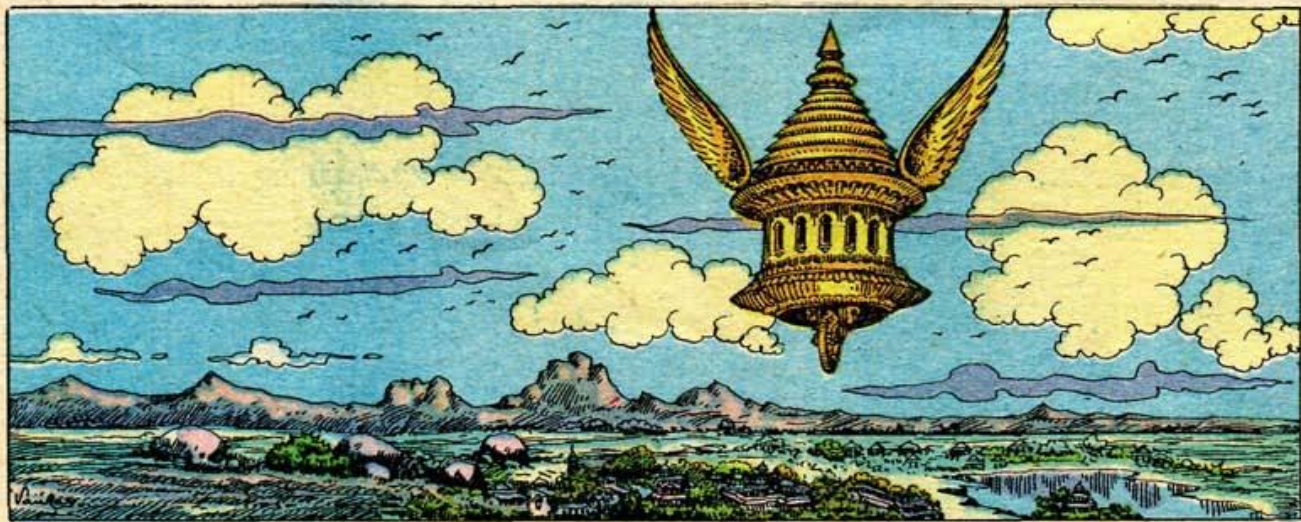
সিংহগড় জয়

সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর একটি শিখরে নির্মিত হয়েছিল সিংহগড়। ঐ গড় দখল করতে মহারাষ্ট্রের রাজারা চেষ্টা করেছিলেন। মোগল রাজারাও চেষ্টা করেছিল। অবশেষে সেই সিংহগড় দুর্দ্ধর্ষ মোগলরা মোগল সৈন্য বাহিনীর উদয়ভানুর নেতৃত্বে দখল করে নিল।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মারাঠা বীর শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে থাকতেন। শিবাজীর মা জীজাবাঈ একদিন সকালে পূজোপাট সেরে জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দূরে সিংহগড় দেখতে পেয়ে তাঁর মনে একটা চিন্তা জাগল।

শিবাজীর শরীর ভালো না থাকায় তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করছিলেন; মনমেজাজ ভাল ছিল না। তাই তিনি মার সঙ্গে দাবা খেলতে বসলেন। মা বললেন, "বাবা, তুমি হেরে গেলে আমাকে কি দেবে?" জবাবে শিবাজী বললেন, "যা চাইবে তাই দেব, মা।"

সম্প্রাপ্ত মবমানম্ যঃ
তেজসা ন প্রমার্জতি,
কস্তস্য পুরুষার্থোস্তি
পুরুষস্যাল্পতেজসঃ। ॥ ১ ॥

[যে পুরুষ পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে অবমাননা দূর করে না সেই তেজহীন পুরুষ কখনই সিদ্ধ হতে পারে না।]

হীনম্ রতি গুণৈস্সর্বৈ
রভিহন্তার মাহকে,
ত্যজন্তি নৃপতিম্ স্তৈন্যাঃ
সম্বিগ্নাস্তম্ নরেশ্চরম্। ॥ ২ ॥

[যে রাজা সবসময় পীড়ন করে, যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী তাকে পরিত্যাগ করে।]

সর্বকাল সমৃদ্ধম্ হি
হস্তস্বরথসঙ্কুলম্,
পিতৃপৈতামহম্ রাজ্যম্
কস্য নাবর্তযেন্মনঃ? ॥ ৩ ॥

[বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে বাহুবলে সুরক্ষিত দেশ সহজে কে ছাড়তে চায়?]

উক্তি

শিবাজী দাবা খেলায় হেরে গিয়ে বললেন, "মা, বল কি চাও।" জীজাবাঈ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাবা, আমি চাই ঐ সিংহগড়।" মার কথা শুনে বীর শিবাজীও চমকে উঠলেন। কারণ সিংহগড় দখল করা অত সহজ ছিল না।

তবু, শিবাজী মাকে কথা দিয়েছিলেন। তাই তিনি উপযুক্ত লোকের সন্ধান করলেন। তিনি খবর পাঠালেন তানাজীর কাছে। তানাজী তখন ছেলের বিয়েতে ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও শিবাজীর ডাক শুনে ছুটে গেলেন।

শিবাজী নিজের মায়ের দাবীর কথা তানাজীকে খুলে জানালেন। তানাজী তৎক্ষণাৎ এক হাজার সুদক্ষ সেনা নিয়ে সিংহগড়ের দিকে রওনা দিলেন।

সিংহগড়ের পাহারাদারেরা তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। তানাজী নিজের সেনাবাহিনীকে দুর্গের পেছনে সাজালেন। শিবাজী তানাজীকে দিয়েছিলেন একটি পোষা সুশিক্ষিত গোসাপ। তানাজী গোসাপের কোমরে দড়ি বেঁধে ছেড়ে দিলেন। গোসাপটি দেওয়াল বেয়ে উঠে দড়ির একপ্রান্ত গাছের সঙ্গে জড়িয়ে দিল।

ঐ দড়ি ধরে তানাজী সেনাবাহিনীর তিনশজন সুদক্ষ সৈন্য নিঃশব্দে দুর্গের ভেতরে ঢুকে গেল। তখনও দুর্গের পাহারাদাররা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।
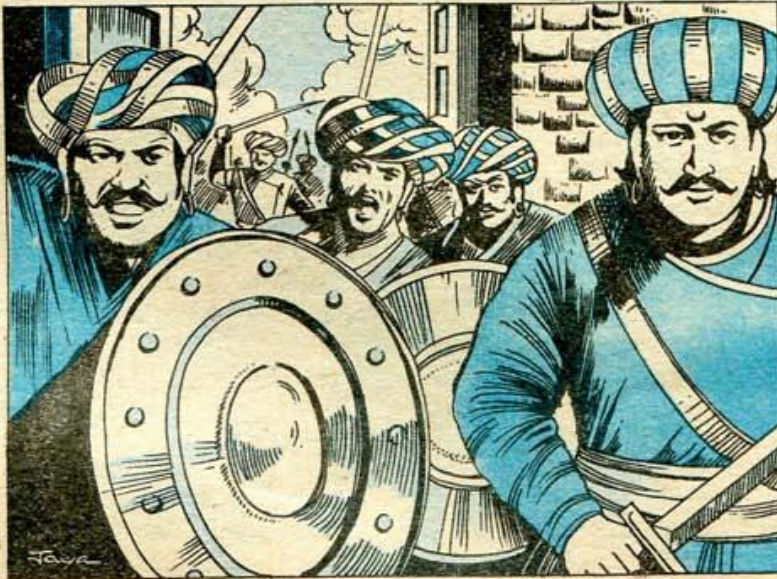
শেষে হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় একজন সশব্দে পড়ে গেল। ঐ শব্দের ফলে কয়েকজন পাহারাদারের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা ডাকাডাকি করে অন্যদের তুলল। কিন্তু তার আগেই যারা ঢুকেছিল তারা দুর্গের দরজা ভেতর দিক থেকে খুলে দিয়েছিল।

তারপর শুরু হল মোগলসৈন্য ও তানাজীর সৈন্যর ভেতর যুদ্ধ। মোগলরা একটি ভয়ঙ্কর হাতি ছেড়ে দিয়েছিল ওদের উপর। হঠাৎ একলাফে তানাজী ঐ হাতির পিঠে উঠে বসলেন। তারপর তিনি ঐ হাতিটিকে চালনা করলেন মোগলদের সৈন্যদের উপর।
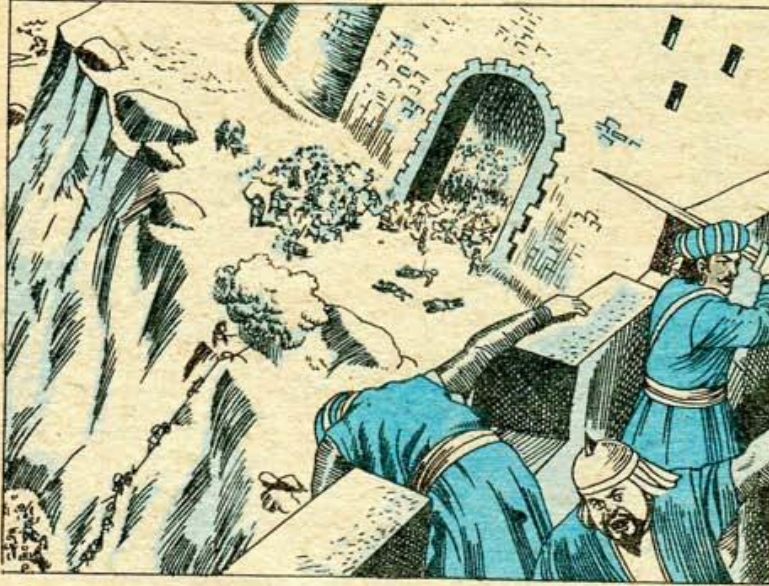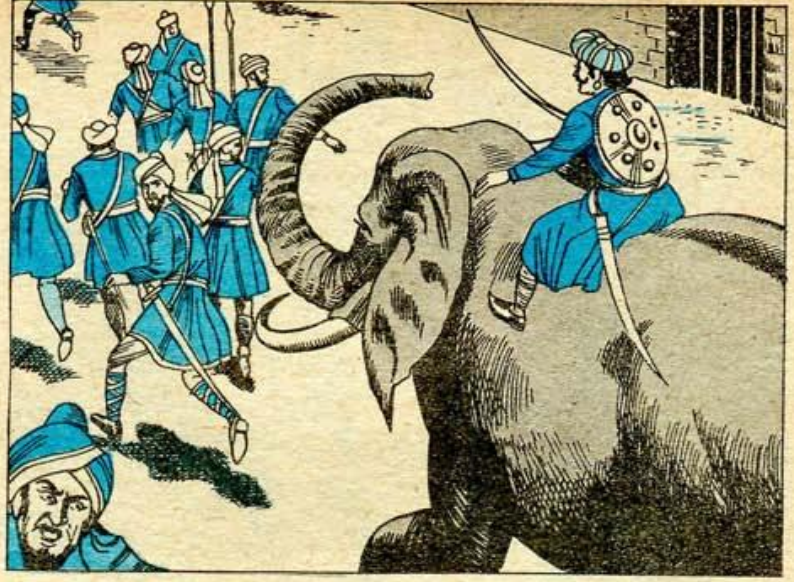
মারাঠা সেনাবাহিনীর সাতশ সেনা তখনও দুর্গের বাইরে ছিল। তানাজী ক্ষিপ্রগতিতে যোগ্যতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করায় অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা দুর্গ দখল করতে পারলেন।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে তানাজী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষ সেনাপতি তানাজীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শিবাজী শোকাহত হয়ে বলেছিলেন, "গড় পেয়েছি কিন্তু সিংহ হারিয়েছি।"
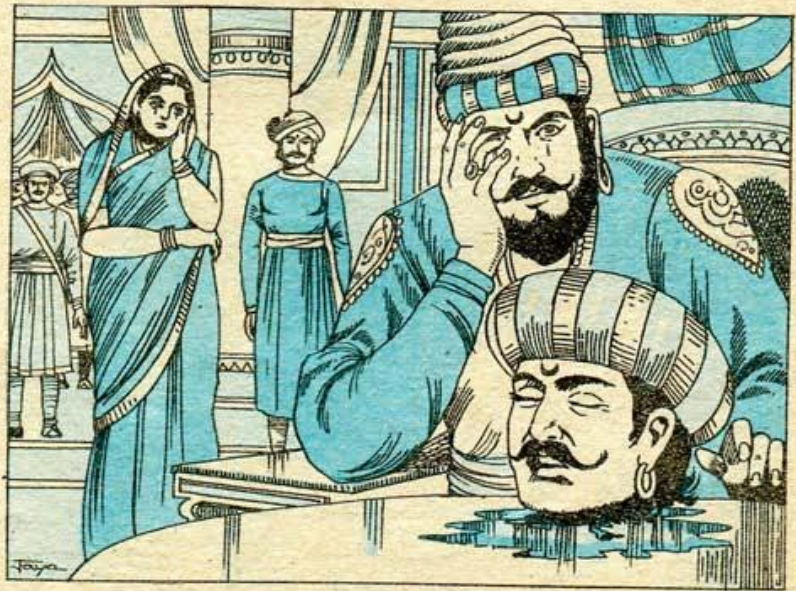
গল্পের নামকরণ প্রতিযোগিতা

এই গল্পের ভাল নাম দিয়ে ২৫ টাকা জিতে নিন

?

অবন্তীবর্মার বন্ধু তার কাছে এসে বলল, "বন্ধু, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি তো জান, আমার ভাই রাজধানীতে থাকে আর আমি লেখাপড়া জানি না। ভাইয়ের কাছে একটা চিঠি লিখতে চাই। তুমি লিখে দাও তো।"

"এ আর এমন কি কাজ। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান আমি তো এখন রাজধানীতে যাবো না।" অবন্তীবর্মা বলল।

"সেকি! আমি তোমাকে রাজধানীতে যেতে বলছি নাকি? আরে ভাই, তুমি আমার ভাইয়ের কাছে একটা চিঠি লিখে দাও। আমি তোমাকে চিঠি লিখতে বলছি, যেতে বলছি না।"

"সেটা আমি বুঝেছি। কিন্তু কথা কি জান, আমার হাতের লেখা তো আমি ছাড়া কেউ পড়তে পারে না।" অবন্তীবর্মা বন্ধুকে বুঝিয়ে বলল।

* * *

এই গল্পের ভালো একটা নাম পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতে হবে। কার্ডের উপর 'গল্প নামকরণ প্রতিযোগিতা' স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। কার্ড পাঠানোর ঠিকানা:

CHANDAMAMA (BENGALI), 2 & 3 ARCOT ROAD, MADRAS-600 026

পোস্টকার্ড ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছানো চাই। এই কার্ডে ফটো নামকরণ বা অন্য কোনো ধরনের প্রশ্ন লেখা চলবে না। ফল ফেব্রুয়ারী '৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

অক্টোবর '৭৭ গল্প নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল:

গল্পের নাম : বাস্তবের মুখোমুখি

পুরস্কার পেয়েছেন: গৌতম কুমার দাস, ফুলেশ্বর, হাওড়া।

[পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে।]

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা : পুরস্কার ২৫ টাকা

পুরস্কৃত নাম ফেব্রুয়ারী '৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

S. Paramasivan

Sambhu Mukherjee

* ফটো নামকরণ দুচারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই।
* ২০ শে ডিসেম্বর '৭৭-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই। তার পরে পৌঁছানো চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না।
* জয়ী প্রতিযোগীকে ঐ দুটো নামের জন্য মোট ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।
* দুটো ফটোর নামকরণ শুধুমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কার্ডে অন্য কোন বিষয় লেখা চলবে না।

CHANDAMAMA PHOTO CAPTION COMPETETION, (BENGALI),
2 & 3 ARCOT ROAD, MADRAS-600 026

অক্টোবর '৭৭ ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম ফটোর নাম : সাধনায় চাই মুক্তি

দ্বিতীয় ফটোর নাম : ভ্রমণ মানেই মুক্তি

পুরস্কার পেয়েছেন : অসীম কুমার ভৌমিক, অশোকনগর, ২৪ পরগণা।

[পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যে পাঠানো হবে।]

Printed by B. V. REDDI at Prasad Process Pvt. Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for CHANDAMAMA CHILDREN'S TRUST FUND (Prop. of Chandamama

* নতুন ও শক্তিশালী
* এক্সপোর্ট কোয়ালিটি
* ৪ ব্যাণ্ডের অল্ ওয়াল্ড "ঘুঙ্‌রু" ট্রানজিষ্টর
* স্বল্প ব্যাটারী খরচে সবচেয়ে দুর্বল ষ্টেষণও ধরার জন্য স্বয়ংক্রিয় এরিয়্যাল।
* সর্বাধুনিক নক্সা ও মনোরম রঙের সুন্দর আর অ-ভঙ্গুর প্লাষ্টিকের ক্যাবিনেট।
* সীমিত ষ্টক।

বিনামূল্যে

* প্রতিটি ট্রানজিষ্টরের সঙ্গে উপহার
* ৫ টাকা ক'রে মাসিক কিস্তিতে পার্সেল ডাকে প্রতি শহরে ও গ্রামে পাঠানো যায়।
* আজই অর্ডার দিন।

SUPREME TRADERS (CM)
63, Defence Colony, Flyover Bridge Market, New Delhi-110024

Toothsville on the Defence

For months now, Demon Acid Killer COOH* has been threatening to overrun Toothsville. In the National Assembly, the Oral Flora pass a bill to import military hardware.
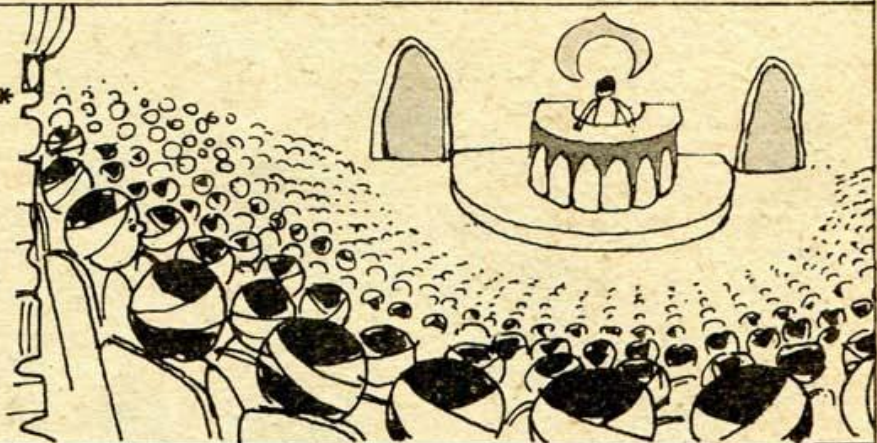
Soon the shiploads of equipment arrive.

The army loses no time in fortifying Tooth Tower...and soon their work is put to the test.
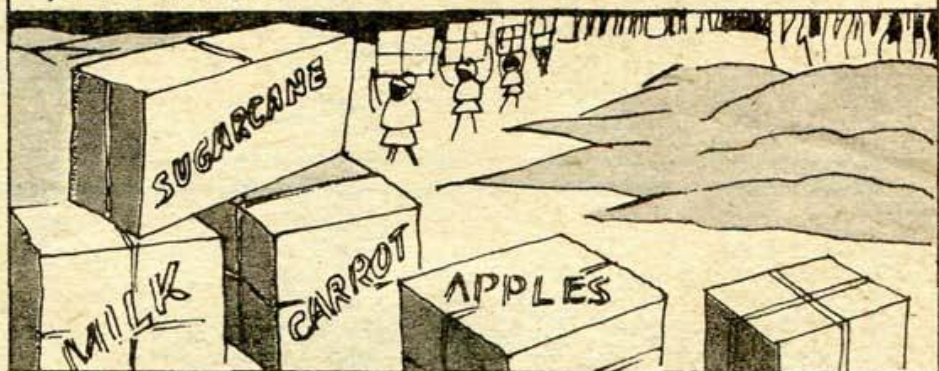
One night, while all are asleep, Killer COOH's raiders launch a surprise attack.
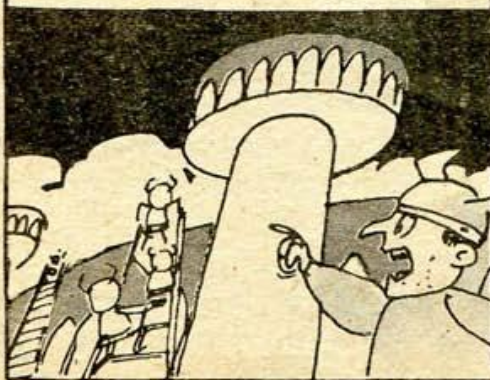
The Oral Flora put up a brave fight but cannot oust Killer COOH who has gained the initiative in taking them by surprise.

Only one hope remains.

Later... Binaca-F races in armed with a deadly weapon: Binaca Fluoride Toothpaste.
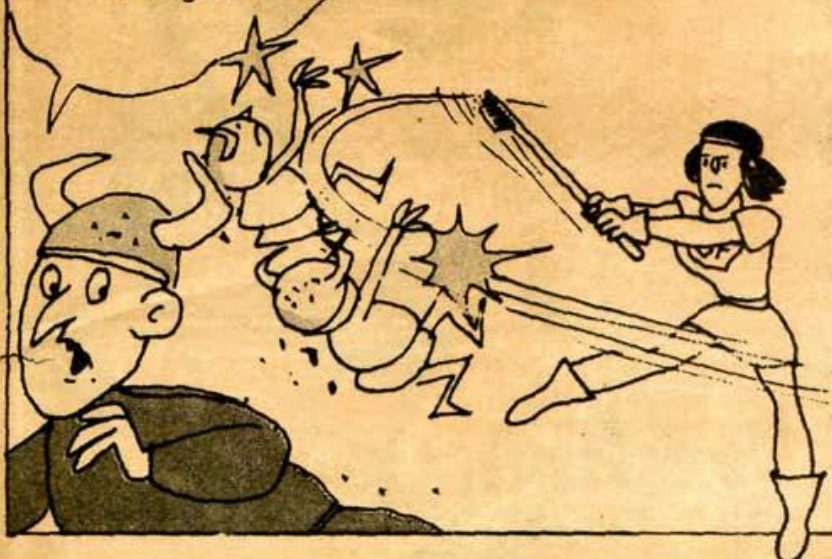
Killer COOH's army is devastated by the combined efforts of Binaca-F and the Toothsville army.
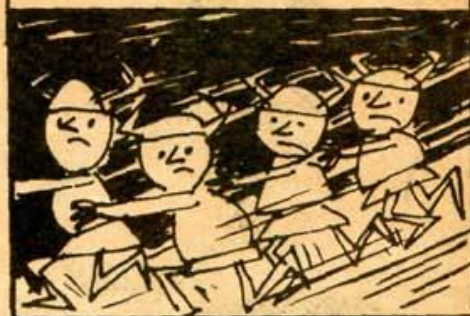
* Formula for carboxyl acid group which attacks tooth enamel and causes painful cavities

U-BF/6/5

মিত্রলাভ

বাহাম

ঐ ব্রাহ্মণ আরও কিছুদূর যাওয়ার পর দ্বিতীয় চোর কুলিমজুরের পোশাক পরে তার সামনে এসে বলল, "ছি ছি, এই মরা বাছুরটাকে আপনি কাঁধে করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? মরা জন্তু জানোয়ার আপনাদের তো ছোঁয়া উচিত নয়। শাস্ত্রে নাকি আছে মরা জীবজন্তু ছুঁলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

"তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছে নাকি হে? জ্যান্ত পাঁঠাকে যে মরা বাছুর বলছ? তোমার আক্কেলটাতো বেশ।" ব্রাহ্মণ রেগেমেগে বলল।

"দেখুন আপনি রাগ করবেন না। যা সত্য তা আমি মুখের ওপর বলে ফেলি। সত্য কথা বলার মত সৎ সাহস আমার সর্বদাই আছে। আমার যা বলার বলেছি, এখন আপনার যা ইচ্ছা করুন।" চোর বলল।

ব্রাহ্মণ আরও কিছুদূর যাওয়ার পর তৃতীয় চোর রাখালের বেশ ধরে তার সামনে এসে বলল, "একি ব্রাহ্মণ, মরা গাধার বাচ্চাকে কাঁধে করে বেড়াচ্ছেন? শুনেছি মরা গাধাকে ছুঁলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আমি দেখেছি, দেখেছি। অন্য কেউ দেখলে তো সর্বনাশ হবে। পাড়ার কেউ দেখার আগে ওটা ফেলে দিন। ভুলে যাচ্ছেন কেন—আপনি গণ্যমান্য একজন ব্রাহ্মণ বটে।"

তখন ব্রাহ্মণ ভাবল, "এই পাঁঠা নিশ্চয় সাধারণ পাঁঠা নয়। আমাকে

জল, ঠগের বাক্‌চাতুর্য প্রভৃতি বিষয়ে যারা ঠকে যায় তারা যে মূর্খ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পেঁচাগুলো ভুল করছে। যতই দুর্বল হোক না কেন সংখ্যায় যদি কেউ বেশি থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে শক্রতা করা উচিত নয়। কাক সংখ্যায় বেশি। ওদের সঙ্গে শক্রতা করার আগে মহাসর্পকে পিঁপড়েগুলো কিভাবে মেরে ফেলেছিল সে কাহিনী মনে রাখা উচিত।"

মেঘবর্ণ বলল, "কই আমি তো সে কাহিনী কখনো শুনিনি। বল তো—বলতো শুনি।" তারপর স্থিরজীবি সেই সাপের কাহিনী শুরু করল ঃ

একবার মহাকায় নামে এক বিরাট সাপ সগর্বে ঘুরে বেড়াত। সেটা ছিল ভীষণ অহঙ্কারী। একবার সে একটা ছোট ফুটো দিয়ে ঢোকার জিদ ধরল। অতবড় দেহ নিয়ে ছোট্ট গর্তে ঢুকে বেরোতে গিয়ে তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হল। রক্ত ঝরল। ফলে দলে দলে ডেঁয়ো পিঁপড়ে এসে রক্তের কাছাকাছি গেল। সাপ বহু পিঁপড়ে মেরে ফেলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে জড়ো হয়ে ঐ সাপকে খেয়ে ফেলল।

এই কাহিনী বলে স্থিরজীবি গোপনে মেঘবর্ণকে বলল, "এই কথা তুমি ভাল

ঠকিয়ে নিশ্চয় আমাকে বিনাশ করতে চায়। এটা হয় ভূত, পিশাচ অথবা রাক্ষস হবে। তা না হলে এটাকে তিনজনে তিনরকম দেখবে কেন?" এই কথা ভেবে ব্রাহ্মণ পাঁঠাটাকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারল বাড়িমুখো হাঁটতে থাকল।

তারপর ঐ তিনজন চোর পাঁঠাটাকে ধরে কেটে মহানন্দে তার মাংস খেল।

স্থিরজীবি ব্রাহ্মণের ঠকে যাওয়ার কাহিনী শেষ করে আবার বলল, "নতুন চাকরের ভক্তিশ্রদ্ধা, খাওয়ার উদ্দেশ্যে আসা অতিথির প্রশংসা, রমণীর চোখের

করে মনে রেখো। যা বলেছি ভুলে যেও না। বিরাট বিপদের দিন আসতে পারে।"

তখন মেঘবর্ণ বড়ই নিরুপায় বোধ করল। সে যে কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। মেঘবর্ণ অসহায় ভাবে স্থির-জীবির পানে কয়েকবার তাকাল। কিছু একটা স্থিরজীবিকে বলতে গিয়েও মেঘবর্ণ বলতে না পেরে থেমে গেল।

তখন স্থিরজীবি স্থিরভাবে মেঘবর্ণকে বলল, "আমার কথা শোন। তুমি আমাকে সকলের সামনে আক্রমণ কর। আমাকে ক্ষতবিক্ষত করার অভিনয় করে আমার গা থেকে রক্ত বের করে আমাকে বটগাছের নিচে ফেলে দাও। তারপর এখান থেকে তোমরা দুইক্রোশ দূরে ঐ পাহাড়ে চলে যাও। আমি আমার ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখিয়ে শত্রুর বিশ্বাস অর্জন করব। ওদের আস্তানায় গিয়ে, দিনের বেলায় ওরা যেহেতু অন্ধ সেহেত অতি সহজেই আমি ওদের মেরে ফেলব। যতক্ষণ না আমি ফিরি ততক্ষণ তোমরা কিন্তু ওখানেই থাকবে।"

তার কথা শেষ হতেই আগের বন্দোবস্ত মত স্থিরজীবি কাককে বলল, "তোমার আবার কি এমন ক্ষমতা আছে ?"

এই কথা শুনে কাক ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবতেই মেঘবর্ণ বলল, "তোমাদের কিছু করতে হবে না। ওটাকে আমি একাই শেষ করে ফেলব।" এই বলে স্থিরজীবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্তাক্ত করে গাছের নীচে ফেলে রাখল।

পেঁচাদের বড়গিন্নী স্থিরজীবির পতন লক্ষ্য করল। সে তার স্বামী অরিমর্দনকে সমস্ত ঘটনা বলল। স্থিরজীবির পড়ে যাওয়াটা অরিমর্দনের বউ দেখল। তার বেশি নয়। মেঘবর্ণ যে ঐ পাহাড়ের দিকে উড়ে গেছে তা সে একদম জানত না।